পদ্মরাগ বুদ্ধ

হেমেন্দ্রকুমার রায়

এস. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স্ প্রাইভেট লিমিটেড
১-সি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

প্রকাশক : প্রভাসচন্দ্র সরকার
এস. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ
১-সি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

নূতন শোভন সংস্করণ
ভাদ্র ১৩৭২
আগস্ট ১৯৬৫

তিন টাকা

প্রচ্ছদ : শতদল ভট্টাচার্য
ব্লক ও মুদ্রণ : রিপ্রোডাকসন সিণ্ডিকেট,
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর : শ্রীবীরেন্দ্রমোহন বসাক
শ্রীদুর্গা প্রিন্টিং হাউস
১০নং ডাঃ কার্ত্তিক বসু স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

পদ্মরাগ বুদ্ধ

পদ্মরাগ বুদ্ধ
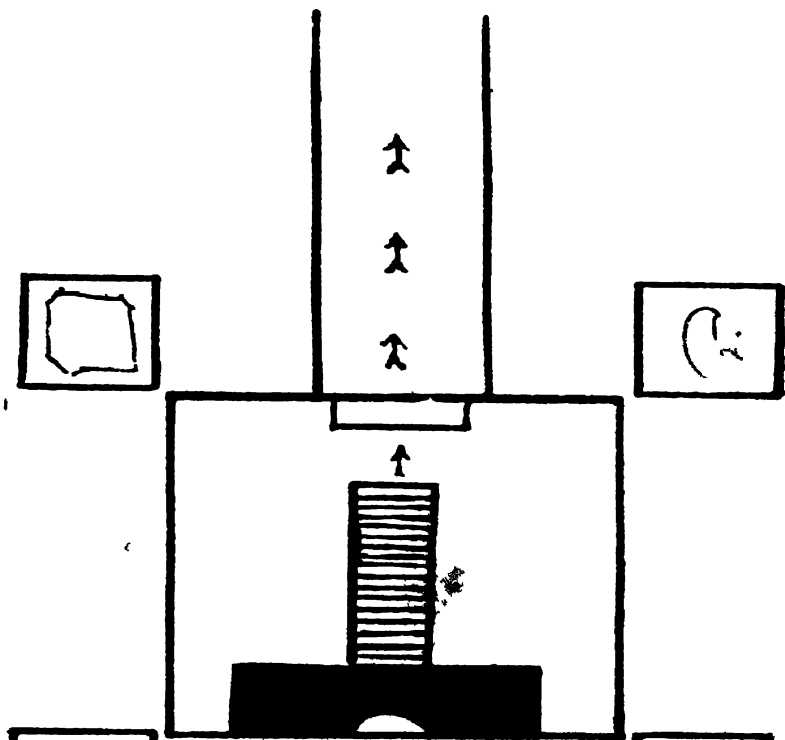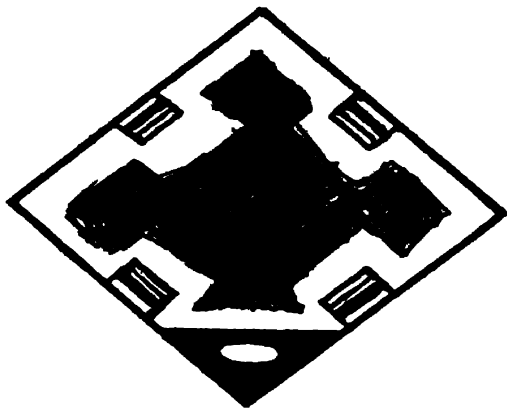
সোনার চাকতির নকসা

২০ পৃষ্ঠা দেখুন

কলকাতায়

ভিনিসের একরাত্রি

জয়ন্ত ও মাণিক সেদিন ডিনার খেতে গিয়েছিল—পার্ক ষ্ট্রীটে এক হালফ্যাসানি বন্ধুর বাড়ীতে।

জয়ন্ত ও মাণিক থাকে বাগবাজারে, কিন্তু তাদের পার্ক ষ্ট্রীটবাসী এই বন্ধুটি ছিলেন সেই জাতীয় মনুষ্য, যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, হগ্-সাহেবের বাজারের উত্তরে আর আধুনিক ভদ্রলোকের বাস নেই। অতএব হগ্-সাহেবের বাজারের দক্ষিণদিকে আস্তানা গেড়ে এঁরা কোঁচানো কাপড় পরেন না, শিঙাড়া কচুরি খেতে ভালোবাসেন না, অ-আ ক-খ ব্যবহার করেন না, ঘড়ি ধ'রে দাঁড়ি কামান, হাঁচেন—কাসেন, স্বপ্ন দেখেন।

জয়ন্ত ও মাণিক যে এই শ্রেণীর বন্ধুর খুব অনুরাগী ছিল, তা নয়। কলেজ ছাড়বার পর এঁর সঙ্গে পথে-ঘাটে তাদের দেখা হয়েছে কালে-ভদ্রে কদাচ।

সখের গোয়েন্দাগিরিতে বারংবার আশ্চর্য্যরূপে সফল হয়ে জয়ন্ত আজকাল কলকাতার একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ব'লে গণ্য হয়েছে এবং সেই খ্যাতির কিছু কিছু অংশ মাণিকও পেয়েছে। তাদের মতন লোককে নিমন্ত্রণ ক'রে এখন বাড়ীতে আনতে পারলেও অনেকে সৌভাগ্য ব'লে মনে করে।

হয়তো সেইজন্যেই পার্কষ্ট্রীট আজ বাগবাজারকে করেছে 'ডিনার'-খাবার নিমন্ত্রণ!

বাগবাজারকে চমকে দেবার জন্যে পার্কষ্ট্রীট কোন আয়োজনেরই ত্রুটি করেনি।

সে-সব দেখে জয়ন্ত ও মাণিক কোনরকম বিস্ময় প্রকাশ করলে না ব'লে গৃহকর্ত্তা বোধ হয় মনে মনে কিঞ্চিৎ হতাশ হলেন।

কিন্তু খানা খাবার টেবিলের উপরে 'মেনু'তে খাদ্যের ফরাসী নামগুলো তাদের কাছে বড় বাড়াবাড়ি ব'লে মনে হ'ল।

জয়ন্ত বললে, "ওহে, এই ফরাসী নামগুলোর ভেতরে গরু আর শুওরের মাংস লুকিয়ে নেই তো?"

গৃহকর্ত্তা এতক্ষণে তো পেয়ে অট্টহাস্য ক'রে বললেন, "কেন হে, গরু আর শুওর সম্বন্ধে এখনো তোমাদের প্রাচীন কুসংস্কার আছে নাকি?"

জয়ন্ত গম্ভীর হয়ে বললে, "তোমার কথার উত্তর দিতে গেলে তর্ক করতে হয়। খানার টেবিলের সাম্‌নে ব'সে তর্ক করার অভ্যাস আমার নেই। আসল কথা, ও-দুটি খাবার আমরা পছন্দ করিনা।"

খানা শেষ হ'লে পর সকলে পাশের একটি ঘরে গিয়ে বসলেন। সে-ঘরটি একেবারে একেলে কায়দায় সাজানো। দেওয়ালে 'কিউবিষ্ট' চিত্রকরদের আঁকা ছবি, টেবিল-চেয়ার প্রভৃতি আসবাবও 'কিউবিষ্ট' কারিগরদের দ্বারা গড়া, এমন কি ঘরের মেঝের 'মোজেকে'র উপরেও 'কিউবিজমে'র প্রভাব।

গৃহকর্ত্তা বললেন, "জয়ন্ত, এ-ঘরটির ডেকোরেশান তোমার কেমন লাগছে?"

—"বেশ। কিন্তু ভারতবাসী যখন ঘরবাড়ী সাজায় তখন সে যদি ভারতের প্রাচীন শিল্পের আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখে, তাহ'লে আমি বেশী খুসি হই।"

—"কিন্তু আমি চাই 'আপ-টু-ডেট্' হ'তে। 'কিউবিজ্‌ম্' হচ্ছে হাল-ফ্যাসানের ঢেউ।"

—"না, কিউবিজ্‌মে'র বয়েস হ'ল ত্রিশ-পঁইত্রিশ বৎসর। এখনকার আর্টে হালফ্যাসান্ এনেছেন 'হাইপার্ রিয়ালিষ্ট্' শিল্পীরা। তাদের নাম তুমি শুনেছ?"

—"না।"

—"তাহ'লে পার্ক ষ্ট্রীটে বাস ক'রেও তুমি 'আপ-টু-ডেট্' হ'তে পারোনি। তুমি জানো, যিনি 'কিউবিজ্‌ম্' আবিষ্কার করেছেন, তিনি এখন 'কিউবিজ্‌ম্' ছেড়ে অন্য পদ্ধতিতে ছবি আঁকছেন ?"

—"না।"

—"তাহ'লে হে বন্ধু, তুমি পার্ক ষ্ট্রীটের কালো কলঙ্ক !"

বন্ধু মনে মনে রেগে ঠোঁট কামড়ালেন। অধিকাংশ আধুনিক বাঙালী-সাহেবের মতন তিনিও লোক-দেখানো আধুনিক হয়েছেন, আর্টের অত খুঁটিনাটির খবর রাখবার উৎসাহ তাঁর নেই।

ডিনারের পর কফির পালা।

কিন্তু কফির পেয়ালায় চুমুক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নামলো যেন আকাশ ভেঙে বৃষ্টির ধারা। হু-হু ক'রে ঝোড়ো-হাওয়া ঘরের ভিতরে ঢুকে প্রথমেই 'কিউবিষ্ট্'দের আঁকা ছবিগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে।

তখনি তাড়াতাড়ি দরজা-জান্‌লা বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল।

এক, দুই, তিন ঘণ্টা গেল, তখনো ঝুপ্-ঝুপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে।

জয়ন্তর চোর-ডাকাত ধরার কাহিনী শুনে গৃহকর্ত্তার সময় কিন্তু বেশ কেটে যাচ্ছে। তাঁর গল্প শোনার উৎসাহ যেন ফুরোতেই চায় না।

কিন্তু শেষ-গল্প শেষ করবার আগেই ঘড়িতে বাজল সাড়ে-বারোটা।

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আর অপেক্ষা করা চলে না। পার্ক ষ্ট্রীট থেকে বাগবাজার—মস্ত লম্বা দৌড় ! ওঠ মাণিক !"

গৃহকর্ত্তা বললেন, "কিন্তু এখনো বৃষ্টি পড়ছে যে !"

—"পড়ুক। চল মাণিক !"

গাড়ী-বারান্দার তলাতেই তাদের মোটর দাঁড়িয়েছিল, তারা মোটরে গিয়ে উঠল।

চৌরঙ্গী তখন একটা প্রকাণ্ড হ্রদে পরিণত হয়েছে।

সেই জলরাজ্যে জনপ্রাণীর সাড়া নেই, কেবল সরকারি আলোক-স্তম্ভগুলো সারি সারি দাঁড়িয়ে দীপ্তনেত্রে যেন সেই নির্জ্জন রাজ্য শাসন করছে, নীরবে।

চৌরঙ্গী ছাড়িয়ে মোটর যখন সেণ্ট্রাল অ্যাভেনিউতে প্রবেশ করল, পথের জলও তখন বেড়ে উঠল।

যতদূর চোখ যায় তাকিয়ে দেখলে মনে হয়, সহরের বুকের ভিতরে সুদীর্ঘ এক নদীর আবির্ভাব হয়েছে!

মাণিক বললে, "বর্ষায় কলকতায় বাস করলে ভিনিসে বাস করা হয়, কারণ তখন কলকাতার রাজপথের সঙ্গে ভিনিসের জলপথের কোন তফাৎই থাকে না।"

জয়ন্ত বললে, "কেবল 'দীর্ঘশ্বাসের সেতু' আর 'গণ্ডোলা' নৌকোর অভাব।"

—"গণ্ডোলার অভাব কর্পোরেশনের দূর করা উচিত। বর্ষা-কালের জন্যে কলকাতার মাঝে মাঝে খেয়াঘাট বসিয়ে নৌকো রাখার ব্যবস্থা করা দরকার। আর 'দীর্ঘশ্বাসের সেতু'র কথা বলছ? বর্ষার সময়ে সারা কলকাতা যত দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তা দিয়ে কি শত শত সেতু তৈরী করা যায় না?"

কিন্তু জয়ন্ত কোন জবাব দেবার আগেই তাদের মোটর হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ড্রাইভার বললে, "হুজুর, গাড়ী আর চলবে না!"

জয়ন্ত বললে, "গাড়ী তো আর নৌকো নয়, এতক্ষণ সে যে নৌকোর কর্ত্তব্যপালন করতে নারাজ হয়নি, এইটুকুই আশ্চর্য্য! এস মাণিক, এখন জলে ঝাঁপ দেওয়া ছাড়া কোন উপায়ই নেই!"

সেখানটা হ্যারিসন রোডের মোড়। বাগবাজার তখন অনেক দূরে।

দুজনে জল ভাঙতে ভাঙতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'ল,—পথের

জলপ্রবাহ ঠিক নদীর মতই কোলাহল করতে করতে ছুটে চলেছে এবং জলের মাঝে মাঝে ভাসছে মরা ও পচা ইঁদুর, কুকুর ও বিড়ালের দেহ!

মাণিক ঘৃণায় নাক টিপে ধ'রে বললে "বাড়ীতে গিয়ে জলে 'পার্মাঙ্গেনেট্ অফ্ পটাস্' গুলে গা না ধুলে আর রক্ষা নেই। জয়, পার্ক ষ্ট্রীটের ডিনার বুঝি আর বাগবাজারি পেটে থাকে না! থুঃ থুঃ।"

জয়ন্ত বললে, "আমি বলি, জয় কর্পোরেশনের! আধুনিক কলকাতার টেক্সো যত বাড়ছে, তার রাস্তার জলের পরিমাণও সেই অনুপাতে দিব্যি বেড়ে উঠছে! অথচ আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে জল নিকাশের ব্যবস্থা করবার অজুহাতে কত লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে!"

দুজনে বিরক্ত মনে হোঁচট্ খেতে খেতে এগিয়ে চলল, তখন তাদের দুর্দ্দশা দেখবার জন্য পথে একটা জ্যান্ত কুকুর পর্য্যন্ত হাজির ছিল না। লাল পাগড়ী পর্যন্ত অদৃশ্য!

বৃষ্টি তখনো থামেনি এবং ঝোড়ো বাতাস তখনো বন্ধ জানলায় জানলায় মাথা খুঁড়ে ভিতরে ঢুকতে না পেরে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে!

হঠাৎ জয়ন্ত ব'লে উঠল, "হুঁ, এই তো চোরের শুভমুহূর্ত্ত! মাণিক, তুমি কি একটা মানুষ-টিকৃটিকি দেখতে চাও?"

মাণিক বিস্মিত নেত্রে জয়ন্তর মুখের পানে তাকালে।

জয়ন্ত আঙুল তুলে বললে, "আমার মুখের পানে তাকিয়ে তুমি আমার মুখ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না,—ঐ বাড়ীখানার তিনতলার দিকে তাকাও!"

পাশেই একখানা ত্রিতল বাড়ী! একটা মনুষ্য-মূর্ত্তি দেয়াল বেয়ে উপরে উঠছে!

মাণিক বললে, "চোর! কিন্তু কেমন ক'রে লোকটা উপরে উঠছে ?"

"ট্যাঙ্কের জলের পাইপ ধ'রে।"

লোকটা হাত বাড়িয়ে বারান্দার রেলিং ধরলে, তারপর ভিতরে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জয়ন্ত বললে, "এস, দেখা যাক্ চোরটাকে ধরতে পারা যায় কিনা ?"

জয়ন্ত বাড়ীর সদর দরজায় গিয়ে খুব জোরে কড়া নাড়তে লাগল।

খানিকক্ষণ পরে ভিতর থেকে হিন্দুস্থানী গলায় কে সুধোলে, "কোন্ হায় রে ?"

—"বাইরে এসে দেখ না বাবা, চ্যাঁচাও কেন ? বাড়ীতে চোর ঢুকেছে !"

হঠাৎ রাস্তার দিক থেকে কোথায় কে তীক্ষ্ণ শীষ্ দিলে !

জয়ন্ত চারিদিকে চেয়ে কারুকেই দেখতে পেলে না। বললে, "মাণিক, এ চোর একলা আসে নি। তার দলের লোক নীচে কোথাও লুকিয়ে পাহারা দিচ্ছে। শীষ দিয়ে উপরের চোরকে সে সাবধান ক'রে দিলে।"

দরজা খুলে বেরুল গালপাট্টাওয়ালা মস্ত একখানা মুখ।

জয়ন্ত বললে, "দরোয়ানজী, রাস্তা থেকে দেখলুম একটা চোর পাইপ ধ'রে তিনতলার বারান্দায় গিয়ে উঠল ! তাকে ধরতে চাও তো শীগ্‌গির আমাদের নিয়ে উপরে চল !"

দারোয়ান তখনি কোণ থেকে নিজের লাঠিটা তুলে তিনবার মাটিতে ঠুকে যা বললে তার সারমর্ম্ম হচ্ছে এই যে, এই লাঠি দিয়ে সে যদি আজ চোরের মাথাটা কাঁধের উপর থেকে উড়িয়ে দিতে না পারে, তাহ'লে মিথ্যাই তার নাম হাতী সিং !

তার সঙ্গে জয়ন্ত ও মাণিক সিঁড়ি দিয়ে দ্রুতপদে উপরে উঠতে লাগল।

—একেবারে তিনতলার বারান্দায়! তিনতলায় দুটো দরজা রয়েছে, দুটোই বন্ধ।

একটা দরজার সামনে গিয়ে দরোয়ান ডাকলে, "হুজুর, হুজুর!"

কেউ সাড়া দিলে না।

কিন্তু জয়ন্তের তীক্ষ্ণ কান শুনতে পেলে, ঘরের ভিতরে ঝটাপটির শব্দ হচ্ছে!

সে দরজায় পিঠের বামদিক রেখে দাঁড়াল। তার সেই ছয়ফুট চার ইঞ্চি উঁচু দেহ আসুরিক শক্তির জন্যে বিখ্যাত, আর এ তো তুচ্ছ একটা কাঠের কবাট! তার দেহেব এক ধাক্কায় ভিতরের খিল ভেঙে গেল—দরজার কবাট সশব্দে খুলে গেল!

ঘরে ঘুট্ ঘুট্ করছে অন্ধকার!

প্রথমেই দেখা গেল রাস্তার বারান্দাব দিকের খোলা দরজা দিয়ে একটা মূর্ত্তি বেরিয়ে যাচ্ছে!

হাতী সিং ছুটে গিয়ে বাঘেব মত তার উপরে লাফিয়ে পড়ল।

প্রথমেই একটা শব্দ হ'ল,—কার হাত থেকে কি একটা জিনিষ যেন মাটির উপরে প'ড়ে ভেঙে গেল! তারপরেই চোখের পলক না পড়তেই বিপুলবপু হাতী সিং কুপোকাৎ!

জয়ন্তও একলাফে বারান্দায় গিয়ে পড়ল, কিন্তু চোর তখন সেখানে নেই!

বারান্দার রেলিংয়ে ঝুঁকে পড়ে জয়ন্ত দেখলে, জলের পাইপ ধ'রে আশ্চর্য্য বেগে সে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে! তাকে আর ধরবার চেষ্টা করা বৃথা।

অন্ধকার ঘরে ঢুকে সে বললে, "হাতী সিং, তুমি উঠেছ?"

হিন্দী ভাষায় সাড়া এল, "উঠেছি বাবুজী! বড়ই জোয়ান চোর, ধ'রে রাখতে পারলুম না!"

—"সে তোমার দোষ নয়। আলোর 'সুইচ্' কোথায়?"

হাতী সিং আলো জ্বালল।

ঘরের একদিকে একখানা খাট। ঠিক তলাতেই মেঝের উপরে প'ড়ে একটি প্রৌঢ় বাঙালী ভদ্রলোক অত্যন্ত হাঁপাচ্ছেন।

জয়ন্ত ও মাণিক তাঁর পাশে গিয়ে বসল।

প্রথমেই জয়ন্তের চোখ পড়ল ভদ্রলোকের গলার উপরে—সেখানে মানুষের আঙ্গুলের রাঙা ছাপ্! চোর তাঁর গলা টিপে ধ'রেছিল।

ভদ্রলোকের বয়স হবে চল্লিশ। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। গৌরবর্ণ। দোহারা দেহ।

হাতী সিং জল এনে তাঁর গলায় ও মুখে ঝাপ্টা দিতে লাগল।

খানিকক্ষণ পরে ভদ্রলোক কতকটা সাম্‌লে নিয়ে উঠে বসলেন। ধীরে ধীরে বললেন, "আপনারা কে তা জানি না। কিন্তু আপনারা না এসে পড়লে আমি বাঁচতুম না। গেল হপ্তায় আমার সহকারী বন্ধু সুরেন বাবুকে কে খুন করেছে, আর আজ আমিও পরলোকে চ'লে যাচ্ছিলুম!"

মাণিক বললে, "আমি খবরের কাগজে পড়েছি, গেল-হপ্তায় বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক অমলচন্দ্র সেনের সহকারী সুরেন্দ্রনাথ বসুকে কে হত্যা ক'রে পালিয়েছে। আপনি কি সেই সুরেন বাবুর কথা বলছেন?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"তাহ'লে আপনিই হচ্ছেন প্রত্নতাত্ত্বিক—"

—"অমলচন্দ্র সেন।"

জয়ন্ত অবাক হয়ে অমল বাবুর মুখের দিকে তাকালে।

অমল বাবুর বিখ্যাত নাম সেও শুনেছে বটে, কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিকের নিরীহ দেহের উপরে এমন মারাত্মক আক্রমণ কেন?

পুরাণো পোকায়-কাটা পুঁথিপত্র, অচল সেকেলে মুদ্রা আর ভাঙা ইট-কাঠ-পাথর নাড়াচাড়া করা যাঁদের একমাত্র পেশা,

তাঁদেরই একজনকে পাঠানো হয়েছে পরলোকে এবং আর একজনকেও—

তার চিন্তায় বাধা পড়ল।

অমলবাবু হঠাৎ সবিস্ময়ে ব'লে উঠলেন, "ওকি, ঐ বুদ্ধমূর্ত্তিটা ওখানে প'ড়ে কেন? ওটা ভাঙলই বা কি ক'রে?"

জয়ন্ত চেয়ে দেখলে, বারান্দার দিকে দরজার সামনে মাটির উপরে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি প'ড়ে রয়েছে, তার মুণ্ড ভেঙে আর-একদিকে গড়িয়ে গিয়েছে।

সে বললে, "এখন বোঝা যাচ্ছে, হাতী সিং যখন চোরকে আক্রমণ করে, তখন ঐ মূর্ত্তিটাই চোরের হাত থেকে প'ড়ে ভেঙে গিয়েছিল! শব্দটা আমি তখনি শুনেছিলুম, কিন্তু কারণ বুঝতে পারি নি।"

অমলবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, "এত জিনিষ থাকতে চোর ঐ বুদ্ধমূর্ত্তি নিয়ে পালাচ্ছিল? চোর ঐ—বুদ্ধমূর্ত্তি—নিয়ে—"

বলতে বলতে তিনি হঠাৎ আবার থেমে গেলেন!

জয়ন্ত নীরবে তাঁর ভ-ভঙ্গি লক্ষ্য করতে লাগল।

সে বেশ বুঝলে, অমলবাবু আজকের এই বিপদের একটা হদিস্ খুঁজে পেয়েছেন।

খানিকক্ষণ পরে অমলবাবু বললেন, "আপনারা আমার প্রাণ-রক্ষা করলেন, কিন্তু আপনাদের পরিচয় জানা হ'ল না তো?"

জয়ন্ত বললে, "জানবার মত পরিচয় আমাদের কিছুই নেই। আমার নাম জয়ন্ত আর আমার বন্ধুর নাম মানিকলাল। আমাদের সখ হচ্ছে গোয়েন্দাগিরি।"

—"আপনাদের কথা আমিও বোধহয় শুনেছি। বৈজ্ঞানিক অপরাধী ভবতোষ মজুমদারকে আপনারাই কি ধরিয়ে দিয়েছিলেন?"

—"অনেকটা তাই বটে। কিন্তু পুলিস বলবে ভবতোষকে ধরেছিলেন ইন্‌স্পেক্টার সুন্দরবাবু।"

—"পুলিস যা বলে বলুক্, কিন্তু আসল বাহাতুরি কার লোকে তা জানে। আপনারা এখানে এলেন কেমন ক'রে?"

জয়ন্ত সব খুলে বললে।

অমলবাবু বললেন, "জয়ন্তবাবু, ভগবান আপনাদের এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, "অনেকটা সেই রকমই মনে হয় বটে! নইলে হঠাৎ এই তুর্য্যোগ, জলমগ্ন রাস্তা, মোটরের বিদ্রোহ, যথাসময়ে আপনার বাড়ীর সামনে আমাদের আবির্ভাব—এ-সমস্তই অর্থহীন হয়ে পড়ে।"

অমলবাবু বললেন, "দেখুন, ঐ বুদ্ধমূর্ত্তিটি এতদিন আমার সহকারী সুরেনবাবুর বাড়ীতে ছিল। ঐ মূর্ত্তিটি আমরা চারমাস আগে কাম্বোডিয়ায় গিয়ে পেয়েছিলুম।"

—"কাম্বোডিয়ায়? যেখানে জঙ্গলের ভিতরে প্রসিদ্ধ প্রাচীন হিন্দুমন্দির 'ওঙ্কারধাম' আছে?"

—"হ্যাঁ। সেই পিরামিডের চেয়েও আশ্চর্য্য মন্দির থেকে আরো তফাতে, জঙ্গলের ভিতরে প্রাচীন হিন্দুদের আরো অনেক কীর্ত্তি লুকানো আছে। সেই খোঁজে গিয়েই আমরা এই বুদ্ধমূর্ত্তিটি পাই। এই মূর্ত্তি পাওয়ারও একটা বিচিত্র ইতিহাস আছে, সে কথা পরে বলব।"

জয়ন্ত বললে, "মূর্ত্তিটি এতদিন সুরেনবাবুর কাছে ছিল,—তারপর?"

অমলবাবু বললেন, "গেল হপ্তায় একদিন ঐ মূর্ত্তিটি আমার পরীক্ষা করবার দরকার হয়। আমি মূর্ত্তিটি সুরেনবাবুর কাছ থেকে আনিয়ে নি। ঠিক সেই রাত্রেই কে সুরেনবাবুকে গলা টিপে হত্যা করে। কেবল তাই নয়। সুরেনবাবুর ঘরে আরো অনেক মূর্ত্তি ছিল, হত্যাকারী যে সেগুলো নিয়েও নাড়াচাড়া করেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু হত্যাকারী কোন জিনিষ বা মূর্ত্তি নিয়ে

যায় নি। পুলিস এই হত্যার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণও খুঁজে পায় নি। জয়ন্তবাবু, হত্যাকারী কিসের খোঁজে স্মরেনবাবুর ওখানে গিয়েছিল, বলতে পারেন ?”

—“আপনার আর কিছু বলবার আছে ?”

—“আছে। আমার কোন শত্রু নেই। আজ রাত্রে আপনাদের কড়া-নাড়াব শব্দে আমাব ঘুম ভেঙে গেল। খাট থেকে যেই নেমেছি, অমনি কে আমার গলা টিপে ধরলে—আমি অজ্ঞানের মত হ’য়ে গেলুম। এখন দেখছি, আমার ঘরেও এক হত্যাকারী এসে আর কিছু না নিয়ে ঐ বুদ্ধমূর্ত্তি নিয়েই পালাচ্ছিল, যে-মূর্ত্তি এতদিন স্মরেনবাবুর ঘরে ছিল !”

মাণিক বললে, “আমার তো মনে হয়, স্মরেনবাবুকে খুন ক’রে সেখানে ঐ বুদ্ধমূর্ত্তি না পেয়ে হত্যাকারী আজ আপনার এখানে খুঁজতে এসেছিল।”

জয়ন্ত কিছু বললে না। দরজার কাছে গিয়ে বুদ্ধমূর্ত্তির দেহ ও মাথা মাটির উপব থেকে কুড়িয়ে নিল।

মূর্ত্তিটি চূণপাথরে গড়া। ধ্যানী বুদ্ধের, উচ্চতায় একহাতের বেশী হবে না।

সোনার চাকতির নক্সা

জয়ন্ত বুদ্ধমূর্ত্তির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। কিন্তু তার ভিতর থেকে কোন রকম বিশেষত্বই আবিষ্কার করতে পারলে না। এ-ধরণের লক্ষ লক্ষ বুদ্ধিমূর্ত্তি এসিয়ার সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়।

মূর্ত্তির ভাঙা মাথাটি দেহের উপরে অল্‌তো ভাবে লাগিয়ে জয়ন্ত বুদ্ধদেবকে আবার টেবিলের উপর বসিয়ে দিলে। তারপরে যেন আপন মনেই মৃত্নকণ্ঠে বললে, "হত্যাকারী এই মূর্ত্তিই চুরি করতে এসেছিল ? কিন্তু হিংসার সঙ্গে এই মূর্ত্তিমান অহিংসার সম্পর্ক কি ?"

মাণিক বললে, "হয়তো বিশেষ কোন কারণে ঐ মূর্ত্তিকে কেউ এমন পবিত্র মনে করে যে, ওকে হস্তগত করবার জন্যে সে নরহত্যা করতেও সঙ্কুচিত নয় !"

জয়ন্ত বললে, "এর উত্তরে তুটি কথা বলা যায়। প্রথমতঃ বুদ্ধের প্রতি একটা অতি-ভক্তি থাকা সম্ভব কেবল গোঁড়া বৌদ্ধের। কিন্তু কলকাতায় এমন ভীষণ প্রকৃতির বৌদ্ধ আছে ব'লে মনে হয় না। দ্বিতীয়তঃ কাশীধামে কাক মরলে কামরূপে কেউ হাহাকার করে না। কাম্বোডিয়ার অজানা জঙ্গলে কুড়িয়ে পাওয়া সাধারণ বুদ্ধমূর্ত্তি, তার জন্যে কলকাতার কোন বৌদ্ধের এতটা নাড়ীর টান হবে কেন ? এর চেয়ে ঢের মূল্যবান আর অসাধারণ পুরোণো বুদ্ধমূর্ত্তি কত লোকের ঘরে ঘরে রয়েছে, তাদের জন্য তো কোন বৌদ্ধের মাথাব্যথা হয় না। না মাণিক, এ ব্যাপারের মধ্যে অন্য রহস্য আছে।"

মাণিক বললে, "দেশে লক্ষ লক্ষ কালীর প্রতিমা আছে, তাদের

জন্যে ভক্তরা তেমন পাগল হয় না। কিন্তু শুনতে পাই, কোন কোন কালীর মূর্ত্তি নাকি জাগ্রত, তাদের জন্যে অনেক ভক্ত প্রাণ নিতে বা দিতে প্রস্তুত। কে বলতে পারে, এই বুদ্ধমূর্ত্তিরও তেমন কোন খ্যাতি আছে কিনা ?"

জয়ন্ত বললে, "থাকতে পারে। কিন্তু সে খ্যাতির কথা কাম্বোডিয়ার দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ভিতর থেকে কলকাতায় আসবে কেমন ক'রে ?"

এতক্ষণ অমলবাবু চুপ ক'রে খুব মন দিয়ে জয়ন্ত ও মাণিকের কথাবার্ত্তা শুনছিলেন। এখন তিনি বললেন, "জয়ন্তবাবু, আমার মনে হচ্ছে, মূর্ত্তিটি কেমন ক'রে আমরা পেয়েছিলুম, সে গল্পটাও আপনাদের কাছে বলা উচিত। হয়ত তাহ'লেই আপনাদের কোন কোন প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সহজ হবে।"

জয়ন্ত একখানা চেয়ার টেনে বসে পড়ে বললে, "বলুন। আমরা গল্প শুনতে ভালোবাসি।"

অমলবাবু আর কোনরকম ভূমিকা না করেই বল্‌তে লাগলেন :

"বহুদিন থেকেই আমি কাম্বোডিয়ার ওঙ্কারধামের (ইংরাজিতে Angkor Thom) কথা শুনে আসছি। তাই মাস কয়েক আগে আমি যখন সুরেনবাবুর কাছে প্রাচীন হিন্দুদের এই বিরাট কীর্ত্তিমন্দির দেখতে যাবার প্রস্তাব করলুম, তখন তিনিও খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

কিন্তু আমরা তো সাধারণ ভ্রমণকারী নই, আমরা হচ্ছি প্রত্নতাত্ত্বিক। আমাদের অন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষাও ছিল। শুনেছি, ওঙ্কারধামের চারিদিককার গভীর অরণ্যের মধ্যে এমন আরো অনেক হিন্দুকীর্ত্তি আছে, যা এখনো আবিষ্কৃত হয় নি। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তাদের সন্ধান নেওয়া।

যথাসময়ে যাত্রা করলুম।

তারপর সাগর, নগর ও অরণ্য পার হয়ে কি ক'রে ওঙ্কারধামের

আকাশছোঁয়া ও দৃষ্টিসীমা-ছাড়ানো ধ্বংসস্তূপের পরিত্যক্ত বিজন বিরাটতার ছায়ায় এসে দাঁড়ালুম, সে সব কথা এখানে বলবার দরকার নেই।

গৌরবময় অতীতের এই মূর্ত্তিমান মৃত্যুনিসাড় দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে একদিন আমি আর সুরেনবাবু সবিস্ময়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এমন সময়ে শুনতে পেলুম পাশের ভাঙা মন্দিরের ভিতরে কে কাতর আর্ত্তনাদ করছে।

মন্দিরের মধ্যে ঢুকে দেখলুম, একদিকে একজন বর্ম্মী ফুঙ্গী বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী শুয়ে প্রায় অচেতন অবস্থায় ছট্‌ফট্ ও আর্ত্তনাদ করছেন। তাঁর গায়ে হাত দিয়ে দেখলুম, জ্বরে গা যেন পুড়ে যাচ্ছে।

সুরেনবাবু চিকিৎসা-শাস্ত্র জানতেন, তাঁর সঙ্গে ওষধের বাক্স ছিল।

চিকিৎসার গুণে দুদিন পরে সন্ন্যাসীর অসুখ কিছু কমল। তাঁর মুখে শুনলুম, তিনি ওঙ্কারধামে বেড়াতে এসে এই বিপদে পড়েছেন।

কেবল ওঙ্কারধাম নয়, ইতিমধ্যে এখানকার গহন বনের ভিতরে অদৃশ্য, অনেক অজানা বিস্ময়ও তিনি দেখে এসেছেন।

সন্ন্যাসীর কাছ থেকে অনেক নতুন তথ্য জানতে পারা যাবে বুঝে আমরা প্রাণপণে তাঁর চিকিৎসা ও সেবা করতে লাগলুম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না, হপ্তাখানেক পরে তাঁর অবস্থা একেবারে খারাপ হয়ে পড়ল।

সুরেনবাবু হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, "আর কোন আশা নেই। আজকের রাত্ত বোধ হয় কাটবে না।"

গভীর রাত্রে সন্ন্যাসী আচ্ছন্নের মত বললেন, "সুরেনবাবু, আমার কাছে স'রে এস।"

সুরেনবাবু তাঁর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন "আদেশ করুন।"

সন্ন্যাসী খুব ক্ষীণস্বরে বললেন, "স্ুরেনবাবু, তুমি আর তোমার বন্ধু আমার জন্যে অনেক কষ্ট স্বীকার কবেছ। কিন্তু আমি আর বাঁচব না। মরবার আগে আমি তোমাদের পুরস্কার দিয়ে যেতে চাই।"

স্ুরেনবাবু বললেন, "পুরস্কারেব লোভে আমরা আপনার সেবা করি নি।"

—"সে কথা আমি জানি। সেই জন্যেই তোমাদের পুরস্কার দিতে চাই, তোমাদের সেবার ঋণ নিয়ে আমি মরব কেন? কিন্তু যে পুরস্কার তোমাদের দেব তা বড় সাধারণ পুরস্কার নয়, এর জন্যে পৃথিবীর যে কোন সম্রাটও লালায়িত হতে পাবে। তবে এ পুরস্কার লাভ করবার আগে তোমাদের এক কাজ করতে হবে।"

স্ুরেনবাবু বললেন, "কি কাজ?"

—"তোমাদের সঙ্গে দেখছি ইন্ আব চ্যান্ রয়েছে। ওদের কালকেই বিদায় ক'রে দিও।"

স্ুরেনবাবু সবিস্ময়ে বললেন, "কেন?"

—"ওবা ভালো লোক নয়। ওরা সঙ্গে থাকলে তোমরা বিপদে পড়বে।"

আমাদের দলে জন-বারো কুলি ছিল। চ্যান্ হচ্ছে তাদের সর্দ্দার। ইন্ হচ্ছে আমাদের পথ-প্রদর্শক। এরা যে অকারণে কেন আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করতে চাইবে, তার কোন হদিস খুঁজে পেলুম না।

সন্ন্যাসীর কথা কইতে কষ্ট হচ্ছিল। তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "স্ুরেনবাবু, আমি বুঝতে পারছি আমার শেষ মুহূর্ত্ত ঘনিয়ে এসেছে। এখন আমি যা বলব, খুব মন দিয়ে শোনো। এখানে উত্তর-পশ্চিম দিকে একটা ভাঙা হাতীর মূর্ত্তি আছে। তার ওপাশে একটা সরু পথ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চ'লে গিয়েছে। সেই পথ ধরে তোমরা অগ্রসর হবে। যেখানে পথ নেই, সেখানে জঙ্গলের

ভিতরে পথ ক'রে নেবে—কিন্তু সাবধান, উত্তর-পশ্চিম দিক ছাড়া আর কোন দিকে যেও না। দুদিন পরে প্রকাণ্ড এক প্রান্তরে গিয়ে পড়বে। তারপর—"

এই পর্য্যন্ত বলবার পরেই সন্ন্যাসীর গলা থেকে ক্রমাগত হেঁচ্‌কি উঠতে লাগল।

খানিকক্ষণ পরে সেই অবস্থাতেই থেমে থেমে সন্ন্যাসী বললেন, "তারপর সেই প্রান্তরের ভিতরে দেখবে চারিদিকে পাথরে বাঁধানো একটি পুষ্করিণী। তার এক কোণ থেকে পশ্চিম মুখো একটি রাস্তা আছে। সেই রাস্তার শেষে আছে একটি প্রকাণ্ড মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। প্রধান মন্দিরের চাব কোণে আর চারটি ছোট ভাঙ্গা মন্দিরও আছে!"

সন্ন্যাসীর হাঁপ ও হেঁচ্‌কি আরো বেড়ে উঠল।

কিন্তু আমাদের আগ্রহ তখন জেগে উঠেছে, বারংবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলুম, "তারপর—তারপর?"

কিছুক্ষণ পরে অতি কষ্টে তিনি বললেন, "বড় মন্দিরের মাঝখানে একটি বেদী আছে। তার উপরে আছে ছোট একটি বুদ্ধমূর্ত্তি। তোমরা সেই মূর্ত্তিকে তুলে নিয়ে—"

সন্ন্যাসী আবার থেমে গেলেন, তাঁর দুই চোখ মুদে এল।

সুরেনবাবু তাঁর মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, "তারপর আমরা কি করব?"

কিন্তু সে কথা সন্ন্যাসী শুনতে পেলেন ব'লে মনে হ'ল না। যেন নিজের মনেই অস্ফুটস্বরে তিনি বললেন, "পদ্মরাগ-বুদ্ধ, পদ্মরাগ-বুদ্ধ"—

তারপরেই তাঁর মৃত্যু হ'ল।

এর পরের কথা আমি খুব সংক্ষেপেই সারব।

আমরা সন্ন্যাসীর কথার আসল অর্থ বুঝতে পারলুম না বটে, কিন্তু তাঁর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলুম।

চ্যান আর ইনের প্রাপ্য চুকিয়ে দিয়ে বললুম—আমরা ওঙ্কারধাম ছেড়ে আর কোথাও যাব না। এখানেই হপ্তাহ্‌'য়েক থেকে আবার দেশে ফিরব। আমাদের সঙ্গে কেবল চারজন কুলি রেখে বাকি লোক নিয়ে তারা চ'লে যেতে পারে।

আমাদের হঠাৎ মতপরিবর্ত্তনে তারা বিস্মিত হ'ল বটে, কিন্তু কোনরকম সন্দেহ করতে পেরেছে ব'লে মনে হ'ল না।

সেইদিনই তারা বিদায় গ্রহণ করলে।

সেই অজ্ঞাত মন্দিরে গিয়ে কি দেখব আর কি লাভ হবে, তা আন্দাজ করতে পারলুম না, কিন্তু কি একটা রহস্যের নেশায় আমাদের কৌতূহল এমন ভাবে জেগে উঠল যে পরদিনই উত্তর-পশ্চিম দিকে যাত্রা করলুম।

সেই প্রান্তর, পুষ্করিণী আব চারটি ছোট মন্দিরের মাঝখানে প্রধান একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ,—সমস্তই পাওয়া গেল।

বড় মন্দিরের ভিতবে পাথরের বেদীর উপরে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি বেদীর সঙ্গে গাঁথা ছিল। আমরা গাঁথুনি থেকে মূর্ত্তিটিকে খুলে নিলুম।

কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও সেখানে উল্লেখযোগ্য আর কিছুই আবিষ্কার করতে পারলুম না। সম্রাটেরও পক্ষে লোভনীয় কোন পুরস্কারই সেখানে ছিল না—যদিও আমাদের মত প্রত্নতাত্ত্বিকের পক্ষে লোভনীয় অনেক পুরাতন জিনিষই সেখানে দেখতে পেলুম। বিশেষ, হাজার বছরের পুরাণো যে শিলালিপি সেখানে পেয়েছি, তাইতেই আমাদের সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।

সেখান থেকে ফিরে আসবার সময় সুরেনবাবু খুসি হ'য়ে বললেন, "সন্ন্যাসী বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন, কিসের লোভে আমরা এদেশে এসেছি! যে শিলালিপি আমরা পেয়েছি, তার চেয়ে অমূল্য সম্পদ আর কি থাকতে পারে?"

জয়ন্তবাবু, চোর আজ যে বুদ্ধমূর্ত্তিটি চুরি করবার চেষ্টা করেছিল,

আমরা সেই বহু মন্দিরের ভিতরে পেয়েছিলুম। কিন্তু ও নিয়ে চোরের কি লাভ হ'ত, এ কথাটা কিছুতেই আমি বুঝতে পারছি না।"

জয়ন্ত অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, "অমলবাবু, আপনি বলচেন যে সন্ন্যাসীর শেষ কথা হচ্ছে 'পদ্মরাগ-বুদ্ধ'? কিন্তু 'পদ্মরাগ-বুদ্ধ' নামে কোন বুদ্ধমূর্ত্তির কথা তো আমি কখনো শুনিনি?"

অমলবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "আমিও শুনিনি।"

মাণিক বললে, "কিন্তু পদ্মরাগ মণি ব'লে মহামূল্যবান মণি আছে!"

জয়ন্ত অস্ফুট কণ্ঠে বললে, "সন্ন্যাসী এমন পুরস্কার দিতে চেয়েছিলেন, যার জন্যে পৃথিবীর যে কোন সম্রাট লালায়িত হ'তে পারেন। এঁরা ওখান থেকে এনেছেন চূণ-পাথরের গড়া এক বুদ্ধমূর্ত্তি, আর একখানা শিলালিপি,—রাজা মহারাজার কাছে যা তুচ্ছ! অথচ এই সামান্য বুদ্ধমূর্ত্তিও চোরে চুরি করতে চায়, এর জন্যে মানুষ খুন করতেও ভয় পায় না! আশ্চর্য্য রহস্য!"

সে বুদ্ধমূর্ত্তির ভাঙা মাথাটা টেবিলের উপরে নামিয়ে রেখে দেহটা আবার তুলে নিলে। তারপর তাকে উল্‌টে ধ'রে খানিক্ষণ পরীক্ষা ক'রে বললে, "দেখ মাণিক, এর তলার দিকটা!"

মাণিক দেখলে, মূর্ত্তির তলায় খানিকটা জায়গায় গুঁড়ো পাথরের প্রলেপ মাখানো হয়েছে! সে বললে, "এখানে একটা ছ্যাঁদা ছিল। এখন ভরাট ক'রে দেওয়া হয়েছে!"

জয়ন্ত হঠাৎ মূর্ত্তিটা উঁচুতে তুলে ধরে মাটির উপরে সজোরে নিক্ষেপ করলে, সেটা সশব্দে চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

অমলবাবু হাঁ হাঁ ক'রে ব'লে উঠলেন, "কি করলেন, কি করলেন! ওর পিছনে যে ব্রাহ্মী লিপি ছিল।"

জয়ন্ত সে কথার কোন জবাব না দিয়ে হেঁট হয়ে ভাঙা টুক্‌রোর ভিতর থেকে একটা জিনিষ নিয়ে সকলের চোখের সামনে তুলে ধরলে।

জিনিষটা তামার একটা কৌটোর মত—অনেকটা বিলাতী 'সেভিংষ্টিকে'র কৌটোর মতন দেখতে, তেমনি গোল, কিন্তু তার চেয়ে লম্বা, প্রায় এক বিঘৎ হবে!

জয়ন্ত বললে, "মূর্ত্তির ভিতরটা খুঁদে এই কৌটোটা পুরে, তলার ছ্যাঁদা আবার বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছিল।"

অমলবাবু খানিকক্ষণ হতভম্বের মত চুপ ক'রে থেকে বললেন, "ও কৌটোর ভিতরে কি আছে?"

—"সেইটেই এখন দেখতে হবে। কারণ, এর ভিতরে যা আছে, তার লোভেই আজ এখানে চোরের আবির্ভাব হয়েছিল!"

সে কৌটোর ঢাকুনি খুলে তার ভিতর থেকে বার করলে একটি চাবি ও একটি সোণার চাক্‌তি!

অমলবাবু বললেন, "ও আবার কি?"

জয়ন্ত জবাব না দিয়ে চাক্‌তিটা খানিকক্ষণ পরীক্ষা ক'রে বললে, "এতে কি-একটা নক্সা খোদা রয়েছে।"

—"নক্সা?"

"হ্যাঁ"—ব'লেই সে টেবিলের ধারে আলোর কাছে গিয়ে বসল। তারপর পকেট থেকে কাগজ, পেন্সিল ও 'ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস' বার করলে। বাঁ-হাতে চাক্‌তির উপরে 'ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস' ও ডান হাতে কাগজের উপরে পেন্সিল ধ'রে সে তখনি তাড়াতাড়ি আর একখানা বড় নক্সা তৈরি ক'রে ফেললে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে কাগজে আঁকা নক্সাখানা অমলবাবুর হাতে সমর্পণ করলে।

অমলবাবু কাগজখানার দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে ব'লে উঠলেন, "এ যে প্রান্তরের সেই মন্দিরের নক্সা! এই মন্দিরেই আমরা ঐ বুদ্ধমূর্ত্তি পেয়েছি।"

জয়ন্ত খুব খুসিমুখে পকেট থেকে রুপোর নস্যদানি বার ক'রে দুবার নস্য নিয়ে বললে, "তাহ'লে আসুন অমলবাবু! এই টেবিলের ধারে বসুন! ভালো ক'রে আপনি একবার নক্সাখানা দেখুন। আমার মনে হচ্ছে, সন্ন্যাসী যা ব'লে যেতে পারেন নি, আমরা এইবারে সেই গুপ্তকথাটা জানতে পারব! পদ্মরাগ-বুদ্ধ! পদ্মরাগ-বুদ্ধ। রহস্যময় নাম।"

অমলবাবু নক্সার কাগজখানার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে অনেকক্ষণ ব'সে রইলেন। তারপর বললেন, "দেখুন জয়ন্তবাবু, এখানা যে সেই মন্দিরের নক্সা, তাতে আর একটুও সন্দেহ নেই। সেই চার-ঘাটওয়ালা পুকুর, তার কোণাকুণি রাস্তা, চারিদিকে চারটি ছোট আর মাঝখানে প্রধান মন্দির, এমন কি কালো পাথরের লম্বাটে বেদীটি পর্য্যন্ত মিলে যাচ্ছে, কিন্তু কোন কোন জায়গায় অমিলও রয়েছে।"

জয়ন্ত নক্সার উপরে ঝুঁকে প'ড়ে বললে, "কি কি মিলছে না, আমাকে ভালো ক'রে বুঝিয়ে বলুন।"

—"মন্দিরের ভিতরে, বেদীর সামনে সিঁড়ির মতন ওটা কি আঁকা রয়েছে? আমার বেশ মনে আছে, মন্দিরের ভিতরে ও-রকম কিছুই আমাদের চোখে পড়ে নি।"

—"তারপর?"

—"পুকুরের পশ্চিম কোণে তিন কোণা ঐ কালো অংশটাই বা কি? মন্দিরের বেদীর মাঝখানে একটি সাদা জায়গা আছে—ঐখানেই আমরা বুদ্ধমূর্ত্তি দেখেছিলুম। কিন্তু পুকুরের কোণেও কালোর মাঝখানে সাদা চিহ্ন আছে, বুঝতে পারছি না। পুকুরের ওখানে আমরা জল ছাড়া আর কিছুই দেখি নি।"

—"আর কোন অমিল দেখতে পাচ্ছেন?"

—"না। তবে মন্দির থেকে পুকুরে আসবার পথের উপরে তিনটে তীর-চিহ্ন রয়েছে কেন?"

জয়ন্ত নক্সার দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ ভেবে বললে, "আমার মাথায় কতকগুলো সন্দেহের উদয় হচ্ছে! কিন্তু সেগুলো এখন প্রকাশ ক'রে লাভ নেই, কারণ সে-সব সন্দেহ অমূলক হ'তেও পারে। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি যে অমিলের কথা বলছেন, তারই মধ্যে পদ্মরাগ-বুদ্ধের সমস্ত রহস্য লুকিয়ে আছে।"

অমলবাবু বললেন, "জয়ন্তবাবু, আমার আর একটা কথা মনে পড়ছে। ওঙ্কারধামে যাবার আগে আমরা শ্যামদেশেও বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেখানে একটা জনপ্রবাদ শুনেছি। ও-অঞ্চলে কোথায় নাকি এক মূল্যবান বুদ্ধমূর্ত্তি আছে, তা নাকি দুর্লভ মণি-মাণিক্য কেটে এক সঙ্গে জুড়ে জুড়ে গড়া! কিন্তু সে মূর্ত্তির ঠিকানা কেউ জানে না! অবশ্য এটা আমরা জনপ্রবাদ ব'লেই উড়িয়ে দিয়েছি, কারণ জনপ্রবাদ অসম্ভবকেই সম্ভব করতে চায়!"

মাণিক বললে, "ভেবে দেখ জয়ন্ত, পদ্মরাগও হচ্ছে মহা মূল্যবান মণি! এই মণি দিয়ে যদি বুদ্ধমূর্ত্তি গড়া হয়, তবে তার পদ্মরাগ-বুদ্ধ নাম হওয়া খুবই স্বাভাবিক!

জয়ন্ত বললে, "সন্ন্যাসী এমন পুরস্কার দিতে চেয়েছিলেন, যার জন্যে পৃথিবীর যে কোন সম্রাট লালায়িত হ'তে পারেন!"

—"পদ্মরাগ-বুদ্ধ! আমাদের অনুমান যদি সত্য হয়, তবে সে মূর্ত্তি সম্রাটের পক্ষেও লোভনীয় বটে!"

—"পদ্মরাগ-বুদ্ধ! সে মূর্ত্তি কত বড়? কতগুলো পদ্মরাগ-মণি দিয়ে সে মূর্ত্তি গড়া হয়েছে? মাণিক, এই অসম্ভব সম্পদের কথা ভাবতেও আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে!"

অমলবাবু মাথা নেড়ে হেসে বললেন, "কিন্তু সেই মণিময় বুদ্ধ কোথায় লুকিয়ে আছেন, কেউ তা জানে না!"

জয়ন্ত বললে, "অমলবাবু লোভের মহিমা দেখুন! মণিময় বুদ্ধের নাম শুনেই আমি পরম ভক্ত বৌদ্ধ হয়ে পড়েছি!"

—"কিন্তু জয়ন্তবাবু, এটাও ভুলে যাবেন না যে, সারা মন্দির

তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও আমরা চূণপাথরে গড়া বুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই পাই নি!"

জয়ন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, "আপনিও ভুলে যাবেন না যে, এই চূণ-পাথরে গড়া মূর্ত্তির মধ্যে আমরা পেয়েছি একটি চাবি আর নক্সা-আঁকা চাক্তি! বুদ্ধমূর্ত্তির মধ্যে এমন ছুটো জিনিষ লুকিয়ে রাখবার কথা কে কবে শুনেছে? এত লুকোচুরির কারণ কি অত্যন্ত অসামান্য নয়? সেই কারণটাই কি বুঝিয়ে দিচ্ছে না যে আমরা কল্পনাতীত কোন সুতুর্লভ বস্তু লাভ করতে পারি? এই জন্যেই, এমন একটি সাধারণ মূর্ত্তির লোভে কেউ নরহত্যা করেছে, হয়তো আজ আপনাকেও খুন করত! কিসের এই চাবি? চাবিটা যে-রকম বড়, তাতে মনে হচ্ছে, এর দ্বারা খুব বড় কুলুপই খোলা যায়! সে কুলুপ কোথায় লাগানো আছে? আমার মতে, এই চাক্তির উপরে সেই ভাঙা মন্দিরের নক্সা আছে। কিন্তু নক্সার ঐ সিঁড়ির রহস্যটাই বা কি? ওরকম কোন সিঁড়ি আপনি দেখতে পান নি বটে, কিন্তু নিশ্চয়ই ও-সিঁড়ি কাল্পনিক নয়—নক্সার সবটাই যখন মিলছে তখন ও-সিঁড়ি কাল্পনিক হ'তে পারে না, ওর অস্তিত্ব আছেই।"

অমলবাবু দৃঢ় স্বরে বললেন, "না, ওর অস্তিত্ব নেই!"

জয়ন্তও দৃঢ় স্বরে বললে, "কিন্তু আমি যদি ওর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারি?"

—"কেমন ক'রে?"

—"ওঙ্কারধামে গিয়ে।"

—"ওঙ্কারধামে গিয়ে? সে যে হবে মরীচিকার পিছনে ছোটার মত। ঐ অদৃশ্য সিঁড়ি, আর পুকুরের কোণে আর এক অদৃশ্য রহস্য, এরা কোন্ যাতু-মন্ত্রে আবার দৃশ্যমান হবে?"

—"বুদ্ধির যাতুমন্ত্রে অমলবাবু, বুদ্ধির যাতুমন্ত্রে!"

অমলবাবু আহত কণ্ঠে বললেন, "অদৃশ্য সিঁড়ি দেখতে পাইনি ব'লে আপনি কি আমাকে এক নম্বরের গাধা ব'লে মনে করেন?"

জয়ন্ত ব্যস্তভাবে বললে, "না, না অমলবাবু, আপনাকে বোকা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়! আমার বক্তব্য হচ্ছে, পৃথিবীর বুদ্ধিমান লোকরাও সকল ক্ষেত্রে সমান ভাবে বুদ্ধিকে ব্যবহার করতে পারে না। ধরুন প্রত্নতত্ত্বের কথা। ও বিভাগে আপনার তুলনায় আমার বুদ্ধি একেবারেই অকেজো। আবার, আমার বিভাগে আপনার মাথাও বেশী সুবিধা ক'রে উঠতে পারবে ব'লে মনে হচ্ছে না। এই চাবি আর সোণার চাক্‌তির ব্যাপারটাই ভেবে দেখুন না! বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি আপনাদের কাছে এতদিন ধ'রে রয়েছে, তবু এমন দুটো অদ্ভুত জিনিষ আপনারা আবিষ্কার কবতে পারেন নি! আর একটা প্রমাণ হাতে হাতেই দিতে পারি। এখানে এসেই আমি যখন বারান্দায় গিয়েছিলুম, তখন কতকগুলো কাদা মাখা পায়ের দাগ চোখে প'ড়েছিল! এতক্ষণ সেগুলো পরীক্ষা করবার সময় পাই নি, এইবারে তাদের কাছে যাওয়া যাক। আসুন অমলবাবু, এস মাণিক!"

সকলে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

লম্বা বারান্দায় সারি সারি পায়ের দাগ রয়েছে, তার অনেক-গুলোই বেশ স্পষ্ট।

জয়ন্ত বললে, "এগুলো নিশ্চয়ই চোরের পায়ের দাগ! আচ্ছা অমলবাবু, এই দাগগুলো দেখে আপনার কি মনে হয়?"

অমলবাবু সেগুলোর উপরে একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, "কী আবার মনে হ'বে? ওগুলো হচ্ছে চোরের পায়ের দাগ!"

জয়ন্ত হেঁট হয়ে প'ড়ে দাগগুলো তীক্ষ্ণ নেত্রে পরীক্ষা করতে করতে বললে, "আর কিছু মনে হয় না?"

অমলবাবু বললেন, "আমার মনে হয় দাগগুলো অতিরিক্ত বড়!...কিন্তু জয়ন্তবাবু, পায়ের দাগ নিয়ে অত বেশী মাথা ঘামাবার কি আছে? আসামী যখন পলাতক, তখন ঐ দাগগুলোর ভিতর থেকে তাকে তো আর গ্রেপ্তার করা যাবে না!"

কিন্তু সে কথা বোধ হয় জয়ন্তের কাণে ঢুকল না। পকেট থেকে নস্যদানী বার ক'রে সে ঘন ঘন নস্য নিতে লাগল, নীরবে !

তারপর সে বললে, "পৃথিবীতে যেদিন থেকে অপরাধ সৃষ্টি হয়েছে, সেই দিন থেকেই যে-সব প্রমাণের জোরে অপরাধী ধরা পড়েছে তাদের মধ্যে পায়ের দাগই হচ্ছে প্রধান !"

একটু থেমে, হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে সে আবার বললে, "অমলবাবু, আমি একটি লোকের চেহারার কথা বলব, তাকে আপনি চেনেন কি ? মাথায় সে খুব ঢ্যাঙা, মাপলে সাতফুটও হ'তে পাবে। তার দেহ রীতিমত হৃষ্টপুষ্ট। তার গায়ে অসুরের মতন জোর। সে ডানপাশে একটু বেশী হেলে প'ড়ে হাঁটে। আর—আর তার ডান-পায়ের ক'ড়ে আঙুল নেই !"

প্রথমে অমলবাবু হতভম্বের মতন ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে রইলেন। তারপর তাঁব মুখে-চোখে গভীর বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। তাড়াতাড়ি বললেন, "জয়ন্তবাবু, আপনি চ্যানকে চিন্‌লেন কেমন ক'রে !"

জয়ন্ত দুই ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসার স্বরে বললে, "চ্যান্ ?"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ চ্যান্। ওঙ্কারধামে সে আমাদের কুলির সর্দ্দার ছিল। সন্ন্যাসীর কথায় তাকে আর তার বন্ধু ইন্‌কে আমরা বিদায় করে দিয়েছিলুম। আপনার মুখে এখনি অবিকল চ্যানেরই বর্ণনা শুনলুম, আর তাকে আপনি চেনেন না !"

জয়ন্ত আর এক টিপ্ নস্য নিয়ে খুসিমুখে বললে, "না চ্যান্‌কে আমি চিনি না ! তাহ'লে চ্যানের দেহ হচ্ছে বেজায় ঢ্যাঙা, জোয়ান আর মোটা সোটা ?"

—"হ্যাঁ ! আর তার ডান পায়ের ক'ড়ে আঙ্গুল নেই !"

—"উত্তম ! মাণিক, কাল ভোরে উঠেই আগে আমাদের বন্ধু ইন্‌স্পেক্টার সুন্দরবাবুকে ফোন্ ক'রে সব কথা জানিও। চ্যানের নামে কালকেই যেন ওয়ারেণ্ট বার করা হয়। কারণ খুব সম্ভব

সুরেনবাবুকে সেইই খুন করেছে। আর আজকে চ্যান্ই যে অমলবাবুকে খুন করতে উদ্যত হয়েছিল, তার প্রমাণ ঐ পদচিহ্ন!"

অমলবাবু অভিভূত স্বরে বললেন, "জয়ন্তবাবু, কী বলছেন! চ্যান্ কি কলকাতায় আছে?"

—"পদচিহ্ন তো সেই সাক্ষ্যই দিচ্ছে!"

—"পদচিহ্ন! অসম্ভব, পায়ের দাগে কি চেহারার বর্ণনা লেখা থাকে?"

"থাকে। এ বর্ণনা পড়তে পাবে কেবল বিশেষ বুদ্ধি। পায়ের দাগগুলো আর একবাব ভালো ক'বে দেখুন, বর্ণনা পড়তে বেশী সময় লাগবে না। আপনিও তো দেখছেন, পায়ের ছাপগুলো অতিরিক্ত বড়! সাধারণতঃ ছোট চেহারাব পায়ের দাগ এত বড় হয় না। তারপর প্রত্যেক পদচিহ্নের মাঝখানকার ব্যবধান লক্ষ্য ক'রে দেখুন। এই ব্যবধানের মাপ দেখেও আকৃতির দীর্ঘতা আন্দাজ করা যায়। বেঁটে লোকের চেয়ে ঢ্যাঙা লোকেরা বেশী তফাতে পা ফেলে হাঁটে। দাগগুলো কি-রকম স্পষ্ট দেখেছেন? হালকা দেহ বহন করে যে-সব পা, তাদের ছাপ আরো কম স্পষ্ট হ'ত। ডান পায়েব প্রত্যেক ছাপের ডানপাশটা বেশী চেপে মাটির উপরে পড়েছে; কারণ এগুলো য.র পায়ের দাগ, সে ডানপাশে বেশী হেলে হাঁটে। তার ডান পায়ের ক'ড়ে আঙুল যে নেই, এ সত্য তো ছাপ্ দেখে বালকরাও ধরতে পাববে! আর তার গায়ের জোর তো আমরা সকলেই দেখেছি! সে আজ চোখের পলকে আপনার অত-বড় পালোয়ান দারোয়ানকে কুপোকাৎ ক'রে স'রে পড়েছে! দেখছেন তো অমলবাবু, আমাকে বেশী বুদ্ধি খরচ করতে হয়নি, আমি কেবল বুদ্ধির যথা-ব্যবহার করেছি, সাধারণ লোকে যা করতে পারে না।"

অমলবাবু অস্ফুটস্বরে বললেন,. "কিন্তু চ্যান্ এসেছিল আমাকে

খুন করতে! কোথায় কাম্বোডিয়া, আর কোথায় কলকাতা! কি আশ্চর্য্য।"

—"এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই! ওঙ্কারধামের সন্ন্যাসী তো চ্যান্ আর ইন্ সম্বন্ধে আপনাদের আগেই সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন! নিশ্চয়ই তিনি জানতেন যে চ্যান্ আর ইন্ পদ্মরাগ-বুদ্ধের সন্ধানে আছে। পদ্মরাগ-বুদ্ধকে লাভ করতে হ'লে যে চূণ-পাথরে গড়া বুদ্ধ-মূর্ত্তিটিকে দরকার চ্যান্ কোনগতিকে সেটাও টের পেয়েছে। ঐ মূর্ত্তি এখন আপনার দখলে তাই শত্রুর দৃষ্টি আপনার উপরেই পড়েছে! এতক্ষণে সব রহস্য তো বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল!"

অমলবাবু সভয়ে বললেন, "আমি তো পদ্মরাগ-বুদ্ধ চাই না, তবে আমার প্রাণ নিয়ে এত টানাটানি কেন?"

জয়ন্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললে, "কে বলে আপনি পদ্মরাগ-বুদ্ধ চান না? এক হপ্তার ভিতরেই আপনার সঙ্গে আমরাও যে পদ্মরাগ-বুদ্ধকে আনবার জন্যে ওঙ্কারধামে যাত্রা করব!"

"—বলেন কি মশাই? একটা জনপ্রবাদের পিছনে দৌড়ে অপঘাতে মারা পড়ব? পদ্মরাগ-বুদ্ধের মূল্য যদি লক্ষ-কোটী টাকাও হয়, তাহ'লেও ওর মধ্যে আমি নেই। আপাতত কেবল চ্যানের সাংঘাতিক অনুগ্রহ থেকে আমাকে রক্ষা করুন, প্রতিদানে ঐ চাবি আর চাকতি আপনাদের হাতে আমি সমর্পণ করলুম। পদ্মরাগ-বুদ্ধ পেলে সে মুর্ত্তি নিয়ে আপনারা যা-খুসি-তাই করতে পারেন, তার উপরে আমার আর একটুও লোভ নেই।"

মাণিক বললে, "আচ্ছা, ও-সব কথা পরে হবে অখন। কিন্তু আপাততঃ এইটেই আমি বুঝতে পারছি, না যে, বিদেশী লোক হয়েও চ্যান্ কি করে অমলবাবুর বাড়ীর অন্ধিসন্ধির সব খবর রেখেছে? সে কেমন ক'রে জানলে, অমলবাবুর ঘরের কোথায় বুদ্ধমূর্ত্তি আছে, আর গৃহকর্ত্তা নিদ্রিত? বুঝে দেখ জয়, চ্যান্ অন্ধকারেই ঘরে ঢুকে মূর্ত্তিটিকে অনায়াসে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল!"

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি মাণিকের পিঠ চাপড়ে খুসি কণ্ঠে বললে, "সাবাস মাণিক, সাবাস! তুমি খুব বড় প্রশ্ন তুলেছ, এ-কথা তো আমাব মাথাতে ঢোকে নি? চ্যান্ এত হাঁড়ীব খবব রাখলে কি ক'বে?"

অমলবাবু বললেন, "আপনাব কথা শুনে আব একটা কথা এখন আমাব মনে পড়ছে। আজ কিছুদিন ধ'বে লক্ষ্য কবছি, এই পাড়ায় চাব পাঁচাজন বর্ম্মী লোক প্রায আনাগোনা কবে! দেখলে মনে হয় যেন তাবা এই পাড়াবই বাসিন্দা!"

জয়ন্ত বললে, "তাই নাকি? তা'হ'লে তাবা নিশ্চয়ই এই বাড়ীব উপবে পাহাবা দেয! কিন্তু তাবা ঘবেব ভিতবকাব খোঁজ বাখলে কেমন কবে? আচ্ছা অমলবাবু, পথেব ওপাশে ঐ মস্ত বাড়ীখানায কে থাকে বলতে পা'বন?"

—"ওটা মেস-বাড়ীব মত। ওখানে দেশবিদেশের লোক থাকে, কিন্তু তাবা কেউ বাঙালী নয়।"

—"তাহ'লে ও বাড়ীব তিনতলাব ঘব থেকে আপনাব এই ঘবেব ভিতবে নজব বাখা খুবই সহজ দেখছি! কে বলতে পারে এই মুহূর্ত্তেই ওখানে ব'সে কেউ আমাদেব গতিবিধি লক্ষ্য করছে কিনা?"

অমলবাবু চমকে উঠলেন, ম্লান মুখে বললেন, "বলেন কি? আমি কি তবে শিয়বে শমন নিয়ে বাস কবছি?"

জয়ন্ত বললে, "আচ্ছা, একটা পবীক্ষা কবা যাক্। আমরা দুজনে আপনাকে নমস্কাব ক'বে ঘব থেকে বেবিয়ে যাই। আপনিও প্রতিনমস্কাব ক'বে ঘবেব আলো নিবিয়ে দিন। যদি কোথাও শত্রু জেগে থাকে, সে মনে কববে আমবা বিদায় হয়েছি, আব আপনি আবার শুয়ে পড়েছেন। এই পবীক্ষার ফল কি হয়, দেখা যাক।"

কথা-মত কাজ হ'ল। জয়ন্ত ও মাণিক ঘবেব বাইরে গিয়ে দাঁড়াল, ঘবেব আলো নিবে গেল এবং তাব পবেই বাস্তার দিক থেকে ভেসে এল একটা তীক্ষ্ণ বাঁশীব আওয়াজ।

জয়ন্ত বললে, "যা ভেবেছি তাই। আমাদের উপরে কড়া পাহারা বসেছে। কেউ বোধ করি বাঁশীর সঙ্কেতে কাদের জানিয়ে দিলে যে, 'সবাই হুঁসিয়ার হও, শত্রুরা এখুনি রাস্তায় বেরুবে!' ওরা কি আমাদেরও পথে আক্রমণ করতে চায়? ওরা কি ও-বাড়ি থেকে দেখছে যে, চাবি আর চাকৃতী আমার পকেটে ঢুকেছে? আচ্ছা, এস! আর একবার অন্ধকারে অমলবাবুর ঘরে ঢোকা যাক।"

জয়ন্ত আস্তে আস্তে বারান্দার দরজার কাছে দাঁড়াল।

তখন বৃষ্টির প্রবল ঝোঁকটা কেটে গেছে বটে, কিন্তু জল তখনো ঝিম-ঝিম ক'রে ঝরছিল, রাস্তা দিয়ে তখনো হাঁটু-ভোর জলের ধারা কল্ কল্ ক'রে ছুটছিল এবং শেষ-রাতের আকাশের বুকে পুরু মেঘের কালো পর্দ্দা ছিঁড়ে তখনো থেকে থেকে বিদ্যুতের অগ্নি-অক্ষরগুলো ঝক্‌মক্ ক'রে জ্ব'লে উঠছিল।

সেই মুহূর্ত্তেই আবার বিদ্যুৎ ফুটল এবং জয়ন্ত স্পষ্ট দেখলে, ওপাশের বাড়ীর তিনতলার বারান্দা থেকে একটা মূর্ত্তি রেলিংয়ের উপরে সাগ্রহে ঝুঁকে প'ড়ে নীচের পথের দিকে তাকিয়ে আছে!

ক্ষণিক আলোতে তাকে ভালো ক'রে দেখা গেল না—কিন্তু কে সে? চ্যান্, না আর কেউ?

একটি মাত্র ঢিল
ও দুইটী পাখী

অমলবাবু সভয়ে ব'লে উঠলেন, "কি ভয়ানক! দেখুন জয়ন্তবাবু, দেখুন! সত্যিই তো, ও বাড়ীর বারান্দায় একটা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে! এই শেষ রাতে, এমন দুর্য্যোগে রাস্তার দিকে অত আগ্রহে ঝুঁকে প'ড়ে ও-লোকটা কি দেখছে?"

জয়ন্ত বললে, "এতক্ষণ ও লোকটা নিজের অন্ধকার ঘরে ব'সে আমাদেব ঘবের সমস্ত দৃশ্য লক্ষ্য করছিল। এখন ও বেরিয়ে এসে দেখছে যে, চাবি আর চাক্‌তি নিয়ে আমরা পথে বেরিয়েছি কিনা! আমরা পথে বেরুলেই বোধ হয় আমাদের উপরে আক্রমণ হ'বে!"

—"সর্ব্বনাশ! তাহ'লে আপনারা কি করবেন?"

জয়ন্ত হেসে বললে, "অমলবাবু, আমার চেহারা দেখছেন তো? আমাদের শত্রুদের গায়ে কত জোর আছে জানি না, তবে আমি যে একবার একটা ক্ষ্যাপা ষাঁড়কে ধ'রে মাটির উপর কাৎ করেছিলুম, মাণিক সে সাক্ষ্য দিতে পারে! কুস্তি-বক্সিং আমরা দুজনেই জানি। সুতরাং পথে বেরুতে আমাদের কোন ভয় নেই। কিন্তু অকারণে অশান্তি সৃষ্টি না ক'রে আজ আমরা এইখানেই রাতটা কাটাতে চাই। এতে আপনার আপত্তি নেই তো?"

অমলবাবু বললেন, "আপত্তি? বিলক্ষণ! আপনারা কাছে থাকলে আমি তো ধড়ে প্রাণ পাই! যদি চ্যান্ আবার আসে?"

জয়ন্ত বললে, "আজ আর সে এখানে বেড়াতে আসবে না। বরং কাল সকালে আমরাই ঐ সাম্‌নের বাড়ীটায় বেড়াতে যাব।"

—"বলেন কি, ঐ বাঘের বাসায়?"

—"কেন, আপনি তো বললেন ওটা হচ্ছে মেস্ বাড়ী। তা যদি হয়, তাহ'লে ওখানে আরো অনেক লোক নিশ্চয়ই বাস করে? আমরা ওখানে ঘর ভাড়া করতে বা কোন চেনা লোককে খুঁজতে যাব! দিনের বেলায় পাঁচজনের বাসায় নিশ্চয়ই কেউ আমাদের গলায় ছুরি বসাতে সাহস করবে না।"

মাণিক বললে, "কিন্তু ওখানে গিয়েই বা আমাদের কি লাভ হবে?"

—"প্রথম লাভ হ'বে এই যে চ্যান্ ওখানে আছে কিনা সেটা জানতে পারব। অমলবাবু তার চেহারার যে-বর্ণনা দিয়েছেন, চ্যান্‌কে চিনে নিতে আমাদের একটুও বিলম্ব হবে না। দ্বিতীয় লাভ হবে, চ্যান্ ওখানে থাকলে কাল সকালেই তার হাতে হাতকড়ি দেবার ব্যবস্থা করব।"

—"কি অপরাধে, আর কি প্রমাণে?"

—"চ্যান্‌ই যে সুরেনবাবুকে খুন করেছে, আমাদের হাতে আপাতত তার কোন প্রমাণ নেই বটে। কিন্তু চ্যান্ যে এই বাড়ীতে দেওয়াল বেয়ে উঠে চুরি করতে এসেছিল আর অমলবাবুকে খুন করবার চেষ্টা করেছিল তার স্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে বারান্দায় ঐ পদচিহ্নগুলো। ঐ প্রমাণের জোরেই তাকে এখন অনেকালের জন্যে জেল খাটানো যেতে পারে। প্রধান শত্রুকে সরাতে পারলে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে কাম্বোডিয়ায় গিয়ে বনবাসী হ'তে পারব।"

অমলবাবু বললেন, "কিন্তু জয়ন্তবাবু, আপনি ইনের কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন? সন্ন্যাসীর কথা মানলে বলতে হয়, ইন্‌ও আমাদের মস্ত শত্রু। সে কোথায় আছে?"

জয়ন্ত বললে, "তারও চেহারার সঙ্গে অমাদের পরিচয় থাকা দরকার তো! অমলবাবু, অতঃপর আপনি ইনের রূপবর্ণনা করুন!"

অমলবাবু বললেন, "চ্যান্ যেমন অসাধারণ ঢ্যাঙা, ইন্ তেমনি অসাধারণ বেঁটে, মাথায় সে চারফুটের বেশী তো হবেই না, বরং কম

হওয়া সম্ভব। কিন্তু নিজের দীর্ঘতার অভাব সে মিটিয়ে নিয়েছে অসাধারণ মোটা হয়ে! দূর থেকে দেখলে মনে হয়, যেন একটি গোলাকার পদার্থ যাতুকরের মন্ত্রে হঠাৎ জ্যান্তো হয়ে পৃথিবীর উপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে! কিন্তু এত মোটা ও বেঁটে হ'লেও ইন্ অত্যন্ত চট্‌পটে আর চুল্‌বুলে। সে ছোটে ক্রিকেট-বলের মত আর মাটি থেকে লাফ মারে টেনিস-বলের মত। চ্যানের লম্বা চওড়া চেহারা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু ইন্‌কে দেখলে একেবারেই অবাক হয়ে যেতে হয়! আবার চ্যান্ ও ইন্‌কে এক সঙ্গে দেখলেই মনে হয়, ভগবানের অপূর্ব্ব সৃষ্টি বৈচিত্র্যের কথা!"

জয়ন্ত বললে, "চমৎকার! মাণিক, এমন উজ্জ্বল বর্ণনা শোনবার পর আর কি ইন্‌কে চিনে নিতে আমাদের কষ্ট হবে?"

মাণিক বললে "নিশ্চয়ই নয়! অমলবাবু একখানা কথার ফোটোগ্রাফ তুলে আমাদের দান করলেন!"

—"ফোটোগ্রাফ নয় মাণিক, এ হচ্ছে 'এক্সপ্রেসানিষ্ট' চিত্রকরের আঁকা ছবি; এ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এঁকে এঁকে কিছু দেখালে না, কিন্তু মূল ভাবটি হুবহু প্রকাশ করেল। তুমি যদি ইনের সত্যিকার একখানা ফোটোগ্রাফও হাতে পেতে, তাহ'লেও তার স্বরূপ এত সহজে ধরতে পারতে না! কিন্তু যাক্ সে কথা! ভোরের পাখী ডাকবার আগে আপাতত একটুখানি স্বপ্নলোক দেখবার চেষ্টা করা দরকার!"

পরদিন বেলা সাতটার সময়ে আকাশের বিরাট কুম্ভ শূন্য হয়ে গেল—এখন আর এক-ফোঁটাও বৃষ্টি নেই। এবং সূর্য্যের তাপে মেঘগুলোও মোমের মতন গ'লে মিলিয়ে গেল। রাস্তার ময়লা জল কমেছে বটে, কিন্তু এখনো জুতো না ভিজিয়ে পথ চলবার উপায় নেই।

অন্যদিনে এ-সময়ে বিচিত্র জনতার অনৈক্যতানে রাজপথের তন্দ্রা

ছুটে যায়, আজ এখনো তার ঘুম-ঘুম ভাব দূর হয় নি। যার নিতান্ত দায়, সেই-ই পথে পা বাড়িয়েছে। অনেক দোকান এখনো বন্ধ, ফিরিওয়ালাদের আর্ত্তনাদ প্রায় স্তব্ধ, মোটররা এখনো মানুষ-মৃগয়ার লোভে উৎসাহিত হয় নি।

জয়ন্ত ও মাণিক যখন রাস্তার ও-পাশের মস্ত বাড়ীখানার সুমুখে গিয়ে দাঁড়াল, তখনও তার ভিতর থেকে জীবনের কোন কচকচিই জাগে নি।

একটা বুড়ো হিন্দুস্থানী দ্বারবান সদর দরজার চৌকাঠে ব'সে দাঁতনকাঠি চর্ব্বণ করছিল। জয়ন্ত তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "দরোয়ানজী, এ বাড়ীতে ঘর ভাড়া পাওয়া যায়?"

দ্বারবান একটু বিস্মিত ভাবে জানালে যে এখানে ঘর আছে বটে, কিন্তু 'বাংগালী বাবু'দের থাকবার সুবিধা হবে না।

জয়ন্ত বললে, "সে কথা আমিও বুঝি দারোয়ানজী! কিন্তু আমি তো এখানে পরিবার নিয়ে থাকব না, খান দুই-তিন ঘর ভাড়া নিয়ে আমি এখানে আপিস করব, মাড়োয়ারি আর পশ্চিমা লোক নিয়েই আমার কারবার কিনা!"

দ্বারবান জানালে, তিনতলায় চারখানা ঘর খালি আছে, বাবুরা উপরে গিয়ে দেখতে পারেন।

"তিন-তলায়? সেখানে আর ক-ঘর ভাড়াটে আছে?"

শোনা গেল, তিন-তলায় রাস্তার দিকে দুখানা ঘর নিয়ে পাঁচ-ছয়জন বর্ম্মী লোক আছে। ভিতরের দিকে আছে একঘর মাদ্রাজী। বর্ম্মীদের ঘরের পাশেই দুখানা ঘর খালি আছে।

জয়ন্ত আর কিছু জিজ্ঞাসা না ক'রে দ্বারবানের কাছ থেকে চাবি নিয়ে মাণিকের সঙ্গে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করলে।

সিঁড়ি দিয়ে তারা উপরে উঠতে লাগল।

কলকাতার অধিকাংশ মেসবাড়ীর—বিশেষত যেখানে অবাঙালীর বাস—সিঁড়ি হচ্ছে অত্যন্ত ঘৃণাকর স্থান। তার ধাপে ধাপে চোখে

পড়ে কুকুরের বিষ্ঠা, মানুষের মূত্র ও যত রাজ্যের দুর্গন্ধ জঞ্জাল এবং তার দেওয়াল হয়, থুতু পানেব পিক ও অন্যান্য নানা নক্কারজনক মলিনতার দ্বারা চিত্রবিচিত্র। শ্বাস ও চক্ষু বন্ধ ক'বে এবং যতটা-সম্ভব জড়োসড়ো হয়ে সেখান দিয়ে ওঠা-নামা করতে হয়।

জয়ন্ত ও মাণিক এই ভাবেই দোতলায় গিয়ে উঠল।

দোতলায় চাবিদিকে বারান্দা ও তাবপর সারি সারি ঘর। বারান্দা দিয়ে মুখ বাড়ালে ডাষ্ট্‌বিনেব চেয়েও নোংরা এক-তলার উঠান দেখা যায়।

অধিকাংশ ঘবেব দবজা-জানলাই সাবারাত্র ব্যাপী বৃষ্টির জন্যে এখনো বন্ধ এবং তাদের ভিতব থেকে একাধিক নাসিকার তর্জ্জন-গর্জ্জন বাইবে বেগে ছুটে আসছে।

তাবা তিনতলায় উঠতে শুনতে পেলে, তিন-চাবজন লোকের দ্রুত পদধ্বনি!

কিন্তু তিনতলায় উঠে জনপ্রাণীকে দেখতে পেলে না এবং সেখানেও বাবান্দাব ধাবেব প্রত্যেক ঘবের দবজা জানলা বন্ধ রয়েছে।

তাবা চারিদিকেব বারান্দা ঘুরে এল—তবু কারুর দেখা বা সাড়া নেই, এমন-কি এখানে কারুব নাক পর্য্যন্ত ডাকছে না!

মাণিক মৃদুস্বরে বললে, "কিন্তু উপরে এখনি যাদের পায়ের শব্দ পেলুম তারা কে, আব গেলই বা কোথায়?"

জয়ন্ত বললে, "হয়তো তাবাই হচ্ছে চ্যান্‌ ও ইন্‌ কোম্পানীর লোক, আমাদেব সাড়া পেয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে! মাণিক এখন একটু সাবধানে চলা-ফেরা করতে হবে!"

একটা ঘরের দরজায় বাহির থেকে তালা লাগানো রয়েছে।

দ্বারবানের দেওয়া চাবি সেই কুলুপে লাগল। দুজনে ঘরের ভিতরে ঢুকল।

ঘরের মধ্যে একটা দরজা দিয়ে আর একখানা ঘরে যাওয়া যায়। তারপর রাস্তার ধারের বারান্দা।

সেখানে গিয়ে স্মুখের দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বললে, "দেখ মাণিক, এখান থেকে অমলবাবুর ঘরের ভিতরটা পর্য্যন্ত বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে!"

বারান্দার যেখান থেকে কাল রাত্রের সেই মূর্ত্তিটা পথের উপরে পাহারা দিচ্ছিল, জয়ন্ত সেইদিকে পায়ে পায়ে অগ্রসর হচ্ছে, এমন সময়ে আস্তে আস্তে একটা জানলা বন্ধ করার আওয়াজ হ'ল।

মাণিক চুপি চুপি বললে, "বারান্দার ধারের একটা ঘরের জানলা খোলা ছিল আমাদের সাড়া পেয়ে কেউ বন্ধ ক'রে দিলে!"

জয়ন্ত বললে, "হ্যাঁ। বেশ বোঝা যাচ্ছে, এরা আমাদের সন্দেহ করছে। হয়তো আমাদের মৎলব ধ'রে ফেলেছে!"

যেখান থেকে আওয়াজটা এসেছিল সেইখানে গিয়ে তারা দেখলে, একটা জানলা ও একটা দরজা রয়েছে। দুই-ই বন্ধ।

দরজার কড়া ধ'রে জয়ন্ত বারকয়েক নাড়া দিলে। কোন সাড়া নেই।

জয়ন্ত বললে, "এরা বোধ হয় প্রতিজ্ঞা করেছে যে, আমাদের সঙ্গে দেখা করবে না। চল, নীচে নেমে অন্য উপায় চিন্তা করি গে।"

দুজনে আবার ভিতর-বারান্দায় ফিরে এল।

আর-একবার এদিকে-ওদিকে উকিঝুঁকি মেরে তারা সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল—আগে মাণিক, তারপর জয়ন্ত।

হঠাৎ হুড়মুড় ক'রে বিষম একটা শব্দ হল—মাণিক চমকে পিছনে তাকাতে না তাকাতে জয়ন্তের বিপুল দেহ একেবারে তার ঘাড়ের উপরে এসে পড়ল এবং পর মুহূর্ত্তেই ভয়ানক ধাক্কা খেয়ে মাণিক সিঁড়ির উপরে আছাড় খেয়ে পড়ল।

দৈবগতিকে মাণিক হাত বাড়িয়ে রেলিং ধ'রে ফেললে তাই আর নীচের দিকে নেমে গেল না, কিন্তু যন্ত্রণায় সে যেন অন্ধ হয়ে গেল এবং সেই অবস্থাতেই সে শুনতে পেলে যে, জয়ন্তের দেহ গড়াতে গড়াতে দুম্-দুম্ শব্দে নীচে নেমে যাচ্ছে!

তারপরেই চারিদিকে ব্যস্ত পদধ্বনি, চ্যাঁচামেচি, হুড়োহুড়ি! সে বুঝলে, জয়ন্ত হঠাৎ পা-হড়কে সিঁড়ির উপর প'ড়ে গেছে!

প্রায় দুই মিনিটকাল সেইখানে আচ্ছন্নের মত ব'সে থেকে মাণিক অতিকষ্টে উঠে দাঁড়াল এবং আস্তে আস্তে আবার সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

দোতলায় নেমে সে দেখলে, সেখানে মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী ও মাড়োয়ারির ভিড়!

জয়ন্ত বারান্দার রেলিংয়ে ঠেসান দিয়ে পা ছড়িয়ে অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিতের মতন বসে আছে, তার মুখ বুকের উপরে ঝুলে পড়েছে এবং কেউ তার মাথায় জলের ঝাপটা দিচ্ছে ও কেউ পাখা নেড়ে বাতাস করছে!

মাণিক তার কাছে গিয়ে ডাকলে, "জয়, জয়, তোমার কি বড্ড বেশী লেগেছে?"

অভিভূতের মত জয়ন্ত খালি বললে, "হুঁ।"

মিনিট পাঁচেক পরে জয়ন্ত কতকটা প্রকৃতিস্থ হ'ল, তার চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আবার ফিরে এল। সে মুখ তুলে ভিড়ের ভিতরে যেন কা'কে খুঁজতে লাগল।

মাণিক বুঝলে, জয়ন্ত এ অবস্থাতেও চ্যান্ বা ইন্‌কে ভোলে নি! কিন্তু ভিড়ের ভিতরে মগের মুল্লুকের কোন নমুনাই দেখা গেল না।

মাণিক বললে, "জয়, আমি একখানা ট্যাক্সি ডেকে আনব কি?"

জয়ন্ত কষ্টে-সৃষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "না, আমি হেঁটেই যেতে পারব। আগে এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি।"

সকলকে সাহায্য করার জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে জয়ন্ত ও মাণিক ধীরে ধীরে আবার সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল।

রাস্তায় এসে জয়ন্ত নিজের জামার ভিতরকার পকেটে হাত দিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। শুষ্ক স্বরে বললে, "মাণিক, ভিড়ের ভিতরে তুমি কোন বর্ম্মী লোককে দেখ নি?"

—"না। তবে তোমার কাছে যেতে আমার মিনিট ছুয়েক দেরি হয়েছিল। তার মধ্যে কেউ এসেছিল কিনা জানি না।"

—"নিশ্চয় এসেছিল!"

—"কি ক'রে জানলে?"

জয়ন্ত গম্ভীর স্বরে বললে, "মাণিক, আমি পা পিছলে প'ড়ে যাই নি!"

—"তবে?"

—"আমাদেব সুচতুব বন্ধু এক ঢিলে ছুই পক্ষী বধ করেছে!"

—"জয়ন্ত, তোমার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছি না!"

জয়ন্ত খুব-শুক্‌নো হাসি হেসে বললে, "মাণিক, তোমার পবে আমি নামছিলুম। হঠাৎ পিছন থেকে কেউ এমন ভাবে আমাকে একটা প্রবল ধাক্কা মাবলে যে, তোমাকে নিয়ে আমিও হুড়মুড়িয়ে প'ড়ে গেলুম।"

মাণিক সচকিত কণ্ঠে বললে, "বল কি জয়! কে ধাক্কা মাবলে? তাকে দেখেছ?"

—"না, দেখবার সময় পাই নি। তবে তাব গায়ে যে ভীষণ জোর আছে, ধাক্কা খেয়ে সেটা বেশ বুঝতে পেরেছি। তারপর আমি যখন দোতলার বারান্দায় প'ড়ে প্রায় অজ্ঞানের মত হয়ে আছি সেই সময়ে আমাকে সাহায্য করবার অছিলায় অজানা বন্ধু আমার পকেট থেকে সেই বড় চাবিটা আর নক্সা-আঁকা সোনার চাক্তি নিয়ে দিব্যি স'রে পড়েছে।"

—"সর্বনাশ! এখন উপায়?"

জয়ন্ত বললে, "অমলবাবুর বাড়ীতে ফোন আছে। তুমি এখনি গিয়ে ইন্‌স্পেক্টার সুন্দরবাবুকে একদল কন্‌ষ্টেবল নিয়ে এখানে আসতে বল। এই বাড়ীখানা তল্লাস করা ছাড়া অন্য উপায় দেখছি না। তুমি যাও, আমি এখানে দাঁড়িয়ে পাহারা দি।"

গোপীনাথের

মহাপ্রস্থান

একদল পাহারাওয়ালা নিয়ে ইন্‌স্পেক্টার সুন্দরবাবু যখন মাণিকের সঙ্গে এসে হাজির হলেন, জয়ন্ত তখন অস্থির পদে ফুটপাথের উপরে পায়চারি করছে।

অধীর কণ্ঠে সে বললে, "এত দেরি হ'ল কেন সুন্দরবাবু ?"

সুন্দরবাবু তাঁর মাথা-জোড়া ঘর্ম্মাক্ত টাকের উপরে রুমাল চালনা করতে করতে বললেন, "হুম্! দেরি হবে না ? শুনলুম বাড়ী খানাতল্লাস করতে হবে, উপরওয়ালার কাছ থেকে হুকুমনামা আনতে হ'ল যে! কিন্তু ব্যাপার কি জয়ন্ত ? সত্যিই কি তুমি সুরেনবাবুর হত্যাকারীর খোঁজ পেয়েছো ?"

—"আমার তো তাই বিশ্বাস! অন্ততঃ যাকে আমরা ধরতে চাই, সে আজ প্রত্নতাত্ত্বিক অমলবাবুকে খুন করতে উদ্যত হয়েছিল।"

—"হুম্। মাণিকের মুখে সব আমি শুনেছি। শুনে মনে হচ্ছে, তুমি আবার এক নতুন রহস্যসাগর আবিষ্কার করেছ! পদ্মরাগ বুদ্ধ, নক্সা-আঁকা সোনার চাক্‌তি, একটা চাবি! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!"

জয়ন্ত বললে, "এখন ও-সব বোঝাবুঝির চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন। চলুন ঐ বাড়ীর ভিতর যাই।"

—"কিন্তু অপরাধী কি এখনো ওখানে আছে ?"

—"বর্ম্মীদের উপরেই আমার সন্দেহ! কিন্তু এবাড়ীর ভেতর থেকে কোন বর্ম্মী-লোক বাইরে বেরোয় নি। আমি খবর নিয়ে

জেনেছি, এখান থেকে বেরুতে গেলে এই সদর দরজা দিয়েই বেরুতে হবে।"

—"বেশ, তবে চল।"

এত পাহারাওয়ালা দেখে দ্বারবানের দুই চক্ষু বিস্ময়ে ছানাবড়ার মতন হ'য়ে উঠল।

সুন্দরবাবু পুলিসসুলভ কর্কশ কণ্ঠে বললেন, "এই পাঁড়ে!"

দ্বারবান মস্ত একটা সেলাম ঠুকে বললে, "আমি পাঁড়ে নয় হুজুর, আমি হনুমান চোবে!"

—"তুমি হনুমান চোবেই হও, আর জাম্বুবান পাঁড়েই হও, সে কথা আমি জানতে চাইনা! আমাদের তাড়াতাড়ি ওপরে নিয়ে চল!"—তারপর পাহারাওয়ালাদের দিকে ফিরে সুন্দরবাবু হুকুম দিলেন, "এই সেপাইরা! আমার সঙ্গে জন-ছয়েক লোক এস, বাকি সবাই এইখানে পাহারা দাও,—কেউ যেন এই বাড়ীর বাইরে যেতে না পারে!"

জয়ন্ত ও মাণিক সবাইকে নিয়ে তেতলায় গিয়ে উঠল।

বর্ম্মীদের ঘরের দরজা তখনো বন্ধ ছিল।

সুন্দরবাবু পাল্লার উপরে এক লাথি মারতেই ভিতর থেকে কে দরজা খুলে দিলে।

ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখা গেল, চারজন বর্ম্মী বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

সুন্দরবাবু রুক্ষ স্বরে বললেন, "এই মগের বাচ্ছারা! দেশ ছেড়ে তোরা কলকাতায় কি করতে এসেছিস?"

একটা লোক ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বললে, "আমরা এখানে ব্যবসা করতে এসেছি।"

—"হুম্! মানুষ মারবার ব্যবসা? ওহে জয়ন্ত, এ বেটাদের কোন্‌টাকে তুমি চাও?"

বর্ম্মীদের কাছে এগিয়ে এসে জয়ন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্রত্যেকের

আপাদমস্তক লক্ষ্য ক'রে বললে, "তোমরা ক-জন এখানে থাকো ?"

তারা জবাব দেবার আগেই দ্বারবান হনুমান চোবে বললে, "হুজুর ! এখানে দুটো ঘর নিয়ে ছ-জন বর্ম্মী থাকে।

জয়ন্ত বললে, "এরা তো মোটে চারজন দেখছি। আর দুজন কোথায় ?"

একজন বর্ম্মী বললে, "আধঘণ্টা আগে তারা বাইরে বেরিয়ে গেছে।"

জয়ন্ত চুপিচুপি সুন্দরবাবুকে বললে, "লোকটা মিছে কথা কইলো। আমি হলপ্ ক'রে বলতে পারি, আজ সকাল থেকে কোন বর্ম্মী বাড়ীর বাইরে পা বাড়ায় নি।"

—"হুম্, মিছে কথা না ? তাহ'লে বেটাদের মনে নিশ্চয়ই পাপ আছে ! চল, ভেতরেব ঘরটা খুঁজে দেখি !"

কিন্তু অন্য ঘরে ঢুকেও বাকি দুজনের দেখা পাওয়া গেল না।

সুন্দরবাবু ফিরে বললেন, "এই জাম্বুমান পাঁড়ে !"

দ্বারবান হাত জোড় ক'রে বললে, "হুজুর, আমার নাম হনুমান চোবে !"

—"ও একই কথা। .কাল থেকে তুমি দেউড়িতে আছ ?"

—"হাঁ হুজুর !"

—"দুজন বর্ম্মীকে তুমি বাইরে যেতে দেখেছ ?"

—"না হুজুর !"

—"তাহ'লে তারা কি হুস্ ক'রে আকাশে উড়ে গেল ?"

—"বড়ই তাজ্জবের কথা হুজুর ! আরো দুজন লোক এ ঘরে থাকে—একজন ভয়ানক ঢ্যাঙা, আর একজন ভয়ানক বেঁটে !"

মাণিক জয়ন্তের কাণে কাণে বললে, "চ্যান্ আর ইন্-এর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে !"

জয়ন্ত কেবল বললে, "হুঁ।"

সুন্দরবাবু বললেন, "জয়ন্ত, এখন আমাদের কি করা উচিত ?"

জয়ন্ত বললে, "সেই চাকৃতি আর চাবির খোঁজ। যদিও ও-দুটো জিনিষ খুব সম্ভব সেই অদৃশ্য লোক দুটোর সঙ্গেই আছে, তবু একবার এই ঘরদুটো খুঁজে দেখা যাক্।"

খানাতল্লাস সুরু হ'ল।

দুটো ঘরের সমস্ত ওলট-পালট ক'রে এমন কি বিছানার বালিস পর্য্যন্ত ছিঁড়ে খুঁড়ে দেখা হ'ল, কিন্তু চাবি আর চাকৃতি পাওয়া গেল না।

ঘর থেকে বাইরে এসে সুন্দরবাবু বললেন, "সে মগদুটো তাহ'লে বাড়ীর অন্য-কোথাও লুকিয়ে আছে। এই জাম্বুমান—"

—"হুজুর, হনুমান—"

—"না আমি তোমাকে জাম্বুমান ব'লেই ডাকব! বারান্দার ওপাশের ঐ ঘরে কে থাকে?"

—"একজন মাদ্রাজী সদাগর।"

—"আচ্ছা, আগে ঐ ঘরখানাই দেখা যাক। এস জয়ন্ত! এই সেপাই, হুঁসিয়ার! মগের বাচ্ছাগুলো যেন স'রে না পড়ে!"

বারান্দার ওপাশের ঘরের দরজাও ভিতর থেকে বন্ধ ছিল, সুন্দরবাবুর ধাক্কাধাক্কিতেও কেউ খুলে দিলে না।

জয়ন্ত সুধোলে, "হনুমান চোবে, এ ঘরে যে মাদ্রাজী থাকে তার নাম জানো?"

—"জানি হুজুর! গোপীনাথ নায়ডু।"

সুন্দরবাবু হাঁকলেন, "গোপীনাথ! গোপীনাথ!"

কোন সাড়া নেই।

দ্বারবান একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "গোপীনাথবাবু তো খুব ভোরে ওঠেন, তবে এখনো দরজা বন্ধ কেন।"

সুন্দরবাবু আবার পদযুগল ব্যবহার করলেন, চার-পাঁচবার লাথি মারবার পরেই খিল ভেঙে দড়াম ক'রে দরজার পাল্লাদুটো খুলে গেল!

হুড়মুড় ক'রে ঘরের ভিতরে ঢুকেই সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে 'হুম্' ব'লে চীৎকার ক'রে বেগে আবার পিছিয়ে এলেন।

মাণিক বললে, "কি হ'ল সুন্দরবাবু, কি হ'ল ?"

সুন্দরবাবু আবার বললেন, "হুম্!"

জয়ন্ত তাড়তাড়ি ঘরের ভিতরে ঢুকেই যে দৃশ্য দেখলে, তা ভয়াবহ!

দরজার ঠিক সামনেই মেঝের উপরে চিৎ হয়ে চারিদিকে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে একটা লম্বা-চওড়া মাদ্রাজী,—তার বুকের উপরে আমূলবিদ্ধ একখানা মস্ত ছোরা! এবং ক্ষত দিয়ে তখনও রক্তস্রোত বেরিয়ে আসছে!

দ্বারবান বিহ্বল স্বরে ডাকলে, "গোপীনাথবাবু!—গোপীনাথবাবু!"

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, "গোপীনাথবাবু এ-জীবনে আর কথা কইবে না!"

সুন্দববাবু বললেন, "গোপীনাথকে এখনি কেউ খুন করেছে! সাবধান, খুনী ঘরেব ভিতরেই আছে, কাবণ দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল!"

জয়ন্ত ঘরের চতুর্দ্দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, "জানলার দিকে চেয়ে দেখুন খুনী পালিয়েছে!"

একটা খোলা জানলার দুটো লোহার গরাদ দুম্‌ড়ে ফাঁক হয়ে রয়েছে!

জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে সুন্দববাবু বললেন, "বাপ্! গায়ে কত জোর থাকলে এমন লোহার গরাদ তারের মতন দুম্‌ড়ে ফাঁক ক'রে পালানো যায় ?"

. মাণিক বললে, "এ চ্যান্ ছাড়া আর কেউ নয়! কিন্তু চ্যান্ এই গোপীনাথ বেচারাকে খুন করলে কেন ?"

সুন্দরবাবু এদিকে-ওদিকে অঙ্গুলীনির্দ্দেশ ক'রে বললেন, "দেখ মাণিক, ঘরের সমস্ত জিনিষ লণ্ডভণ্ড! যেন কেউ এখানে মালপত্তর উল্টেপাল্টে কিছু খুঁজেছিল!"

ঘরের সর্ব্বত্রই রাশি রাশি চটিজুতা, কাঠের পুতুল, 'ল্যাকারে'র কৌটো প্রভৃতি ছড়ানো রয়েছে !

মাণিক বললে, "দেখছি, সমস্ত জিনিষই বর্ম্মায় তৈরী ! গোপীনাথ কি বর্ম্মা থেকেই এগুলো আনিয়ে ব্যবসা করত ?"

দ্বারবান বললে, "হাঁ বাবুজী !"

সুন্দরবাবু বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, "আবার দেখছি একটা নতুন মামলা ঘাড়ে চাপল। যাই, উপরঅলাদের কাছে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে আসি গে !"

সুন্দরবাবু বাইরে গেলেন। মাণিক বললে, "জয়, তুমি বোবা হয়ে কি ভাবছ বল দেখি ?"

জয়ন্ত দুই হাতের ভিতরে মাথা রেখে একখানা চেয়ারের উপরে বসেছিল। মুখ তুলে বললে, "মাণিক, আমি মনে মনে আঁক কষ্‌ছিলুম। দুই আর দুই যোগ দিয়ে দেখলুম, চার হয়।"

—"অর্থাৎ ?"

—"মন দিয়ে আমার কথা শোনো। আমার কথা সত্যি হওয়া উচিত। নইলে গোপীনাথের মৃত্যুর কোন অর্থই হয় না। এই যে গোপীনাথবাবু, যিনি এইমাত্র স্বর্গারোহণ করেছেন, এঁর ব্যবসা ছিল ব্রহ্মদেশ থেকে মাল আমদানি করা। অতএব ধ'রে নেওয়া যাক, গোপীনাথ নিজেও অনেকবার বর্ম্মায় গিয়েছে আর বর্ম্মী ভাষাও তার অজানা নয়। গোপীনাথ হঠাৎ একদিন এই ঘরে ব'সে দেখলে যে একদল বর্ম্মী লোক সামনের ঐ ঘর দুখানা ভাড়া নিলে। কলকাতার এই পাড়ায় এটা খুব স্বাভাবিক নয়। তারপর সে দেখলে বর্ম্মীদের হাবভাব রহস্যময়। তারা কোন কাজ করে না, কেবল রাস্তার ওপাশে অমলবাবুর বাড়ীর দিকে নজর রাখে, আর বর্ম্মী ভাষায় কি পরামর্শ করে। গোপীনাথও তখন কৌতূহলী হয়ে তাদের উপরে আড়ি পাতলে, তাদের গুপ্তকথা জেনে ফেললে ! তখন সেও তাদের উপরে—আর অমলবাবুর বাড়ীর উপরে পাহারা

দিতে লাগল। কাল রাত্রের সমস্ত ব্যাপার সে স্বচক্ষে দেখেছিল। আমার পকেটে যে চাকতি আর চাবি আছে, গোপীনাথ তা জানত। চ্যান্ আর ইন্ কোম্পানী আজ সকালে ভয়ে আমাদের আক্রমণ করতে পারেনি বটে, কিন্তু গোপীনাথ তাদের চেয়েও সাহসী, এমন সুযোগ সে ছাড়লে না। সে মারলে আমাকে ধাক্কা, আমি পড়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেলুম, সেই ফাঁকে গোপীনাথ আমার চাকৃতি আর চাবির অধিকারী হ'ল। কিন্তু তার দুর্ভাগ্যক্রমে উপরের বারান্দা থেকে চ্যান্ আর ইন্ কোম্পানীর কেউ সেই দৃশ্যটা দেখে ফেললে। তারই ফলে গোপীনাথকে এখন ইহলোক ত্যাগ করতে হয়েছে! মাণিক, আমি কি অঙ্ক কষতে ভুল করেছি বলে মনে কর?"

ইতিমধ্যে কখন সুন্দরবাবু আবার ঘরের ভিতরে এসে ঢুকেছেন এবং জয়ন্তের কথা কিছু কিছু শুনেছেন! তিনি বললেন, "না, জয়ন্ত! তুমি তো অঙ্ক কষছ না, তুমি কল্পনার আকাশে মেঘের প্রাসাদ তৈরি করছ! হুম্, ঐ তো হচ্ছে সখের গোয়েন্দাদের বদ-স্বভাব! তারা যখন কবিত্ব করে, আসল অপরাধী তখন কেল্লা ফতে ক'রে সরে পড়ে!"

সে কথায় কাণ না দিয়ে মাণিক বললে, "তাহ'লে তোমার মত হচ্ছে, গোপীনাথকে খুন ক'রে চ্যান্ আর ইন্ এই ঘর খানাতল্লাস ক'রে চাবি আর চাকতি নিয়ে ঐ জানলা দিয়ে অদৃশ্য হয়েছে?"

জয়ন্ত কিছু বললে না, সামনের দেওয়ালের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

তার দৃষ্টির অনুসরণ ক'রে মাণিক দেখলে, সামনের দেওয়ালের গায়ে একখানা বড় 'ব্রমাইড এন্লার্জমেণ্ট' ছবি টাঙানো রয়েছে! ছবিখানা মৃত গোপীনাথের, কিন্তু উল্টো ক'রে টাঙানো রয়েছে।

মাণিক বললে, "চ্যান্ আর ইন্ দেখছি ছবিখানা নিয়েও টানা-টানি করেছিল, তারপর তাড়াতাড়ি উল্টো টাঙিয়ে পালিয়ে গিয়েছে!"

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, "তারা যদি ঐ ছবিখানা নামাত তা'লে আবার ওখানা টাঙিয়ে রেখে যাবার মাথাব্যথা তাদের হ'ত না বোধ হয়! দেখ না, ঘরের যে সব জিনিষ তারা ঘেঁটেছে, কোনটাই গুছিয়ে রেখে যায় নি।"

—"তবে?"

সুন্দরবাবু বললেন, "আমার মাথা আর মুণ্ডু! এখন উল্টো আর সোজা ছবি নিয়ে গোলমাল করবার সময় নয়, আমাকে কাজ করতে দাও!"

জয়ন্ত বললে, "এ হচ্ছে সম্ভবত গোপীনাথেরই কাজ! সে ছবিখানা নামিয়ে আবার খুব তাড়াতাড়ি টাঙিয়ে রেখেছিল, সোজা হ'ল কি উল্টো হ'ল সেটা দেখবার সময় আর পায় নি।"

—"কিন্তু তার এতটা তাড়াতাড়ির কারণ কি?"

—"ছবিখানা আর একবার নামালেই হয়তো কারণ বোঝা যাবে!"—এই বলে জয়ন্ত উঠে গিয়ে ছবিখানা দেয়াল থেকে নামিয়ে নিলে। তারপর সেখানা উল্টে দেখলে, ছবির পিছনে পিচ্‌বোর্ডের এক জায়গা উঁচু হয়ে আছে এবং দুটো কাঁটা-পেরেকও তুলে ফেলা হয়েছে!

জয়ন্ত পিচ্‌বোর্ড ফাঁক করে ভিতরে আঙুল চালিয়ে দিয়ে টেনে বার করলে, একটা চাবি ও একখানা সোনার চাকতি!

মাণিক ও সুন্দরবাবুর দৃষ্টি একেবারে চমৎকৃত!

জয়ন্ত খুসিকণ্ঠে বললে, "চাবি আর চকতি চুরি ক'রে গোপীনাথ ঘরে এসে ঢুকল। তাড়াতাড়ি জিনিষ দুটো ছবির পিছনে ঢুকিয়ে রেখে দিলে। এমন সময়ে চ্যান্ আর ইনের প্রবেশ। গোপীনাথ বধ। খুনীরা খানা-তল্লাসিতে প্রবৃত্ত। সদলবলে আমাদের পুনরাগমন। জানলা-পথে চ্যান আর ইনের পলায়ন। সুন্দরবাবু দেখছেন, কল্পনার আকাশে মেঘের প্রাসাদ সব সময়ে ব্যর্থ হয় না? আলেকজান্দার একেবারেই পৃথিবী জয় করেন নি, প্রথমে তিনি

কল্পনাতেই পৃথিবী-জয়ের উপায় স্থির করেছিলেন! যার কল্পনাশক্তি নেই, তুনিয়ায় তার পরাজয় পদে পদে!"

সুন্দরবাবু বললেন, "দৈবগতিকে যখন জিতে গেছ, তখন তু'কথা শুনিয়ে দাও ভায়া, শুনিয়ে দাও। এই জাম্বুমান পাঁড়ে—"

—"হুজুর, হনুমান চোবে—"

—"ও একই কথা! নীচে গোলমাল শুনছি! বোধ হয় বড় সাহেব এলেন! তোমরা এখন এখান থেকে চলে যাও।"

জয়ন্ত বললে, "আমাদের হারানিধি আবার ফিরে পেয়েছি, আমাদেরও এখানে থাকবার আর দরকার নেই! কিন্তু সুন্দরবাবু, যাবার আগে আপনাকে একটা কথা ব'লে যাই। এই মামলাটা আপনি অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে মাসখানেক ছুটি নিন।"

—"কেন?"

—"আর আমরা কলকাতায় থাকছি না! এই নাটকের পরের দৃশ্য সুরু হবে একেবারে কাম্বোডিয়াব জঙ্গলে, ওঙ্কারধামের ধ্বংসস্তূপে। আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন।"

সুন্দবাবু বললেন, "হুম।"

ওঙ্কারধামের
যাত্রী

ধান-ক্ষেতের পর ধান-ক্ষেত, তারপর আবার ধান-ক্ষেত! সবুজের পর সবুজ আর সবুজ!

যতদূর চোখ চলে খালি দেখা যায় সমতল ক্ষেত্র! মাঝে মাঝে নারিকেলগাছ, কলাগাছ আর বাঁশবনের ভিড়। তারই ভিতর দিয়ে সোজা চ'লে গিয়েছে একটি সুদীর্ঘ রাঙা রাস্তা। এত সোজা ও লম্বা রাস্তা সহজে নজরে পড়ে না!

মাঝে মাঝে দেখা দেয় নদী! কোথাও আছে সাঁকো, কোথাও খেয়া ঘাটে নৌকায় চ'ড়ে পার হ'তে হয়।

মাঝে মাঝে দেখা দেয় ছোট ছোট গ্রাম।

সরাইখানার সামনে রয়েছে খাবার সাজানো। পথের ধারে উবু হয়ে ব'সে আনামী স্ত্রীলোকেরা চিংড়ীমাছ, কমলা-লেবু ও নারিকেল প্রভৃতি বিক্রী করছে।

ধূলোর স্তূপে খেলা করছে নগ্ন বা নেংটি-পরা শিশুরা।

সেই সিধে রাঙা রাস্তার উপর দিয়ে ছুটছে তিনখানা মোটর।

একখানা গাড়ীতে আছে জয়ন্ত ও মাণিক, পরের গাড়ীতে অমল বাবু ও সুন্দরবাবু, তার পরের গাড়ীতে দরকারি জিনিষপত্র এবং চাকর-বাকর।

সুন্দরবাবু বলছিলেন, "এ যে দেখছি অন্নপূর্ণার স্বদেশ! পাশাপাশি একটানা এত-বেশী ধানের ক্ষেত কেউ কি কখনো চোখে দেখেছে? হুম্!"

অমলবাবু বললেন, "হ্যাঁ। এ দেশ এমনি উর্ব্বর ব'লেই একদল

ভারতবাসী সমুদ্র পার হ'য়ে এখানে এসে নতুন এক রাজ্যস্থাপন করেছিলেন, নতুন এক সভ্যতা গ'ড়ে তুলেছিলেন।"

—"হুম্, ও-সব বাজে উপকথা! আমি বিশ্বাস করি না।"

—"না সুন্দরবাবু, সেই লুপ্ত সভ্যতার শেষ-চিহ্ন যখন স্বচক্ষে দেখবেন, তখন আর অবিশ্বাসের কথাই তুলতে পারবেন না...

"সেই সভ্যতার কিছু কিছু কথা আগেই আপনাকে শুনিয়ে রাখছি।

এ দেশটা আসলে শ্যামদেশেরই অঙ্গ, খুব অল্পদিনই ফরাসীদের অধিকারে এসেছে।

আজ ফরাসীরা এখানে পথঘাট বানিয়েছে নিবিড় বন্ কেটে সাফ করেছে বটে, কিন্তু সেদিন পর্য্যন্ত এটা ছিল বাঘ আর হাতীর নিজস্ব মুল্লুক, এখানকার দুর্ভেদ্য অবণ্যের গভীর রহস্যের মধ্যে অতি-সাহসী মানুষও পদার্পণ করতে ভয়ে শিউরে উঠত! সত্তর বছর আগেও পৃথিবী ওঙ্কারধামেব নাম শোনেনি।

সতেরো শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজ মিশনাবীরা শ্যামদেশে এসেছিলেন ধর্ম্ম-প্রচার করতে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ অরণ্যে ভ্রমণ করতে করতে পাহাড়ের মত প্রকাণ্ড মন্দিরের গগনস্পর্শী চূড়া ও বিপুল এক নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। য়ুরোপে ফিরে তাঁরা অনেকের কাছে সেই বিস্ময়কর কাহিনী প্রচার করেন।

মিশরের পিরামিডের মতন বড় আশ্চর্য্য মন্দির! বাবিলনের মতন বিরাট জনপদ! সবাই গল্প শুনলে বটে, কিন্তু কেউ বিশ্বাস করলে না।

পরে সে গল্পও লোকে ভুলে গেল...

বড় বড় বটগাছ, বাঁশবন, নারিকেল গাছ ও নানাজাতীয় লতাগুল্ম এই লুপ্ত হিন্দুসভ্যতার শেষ-চিহ্নগুলিকে এমন ভাবে ঢেকে রইল যে, বাইরের কোন কৌতূহলী চক্ষু আর তাদের কোন খোঁজই পেলে না...

"দিনের পর দিন যায়—বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ!

ফরাসীরা প্রথমে ব্যবসাসূত্রে ইন্দো-চীনে পদার্পণ করলে।

লোকের মুখে জনপ্রবাদ শোনা গেল, অরণ্যের অন্ধকারে যেখানে সূর্য্যালোক সোনা ছড়ায় না সেখানে অজ্ঞাতবাস করছে এক অদৃশ্য রাজ্যের অদ্ভুত রাজধানী, মাইলের পর মাইলব্যাপী নগরের পর নগর। অপূর্ব্ব মন্দির, বিচিত্র প্রাসাদ! কোন কোন পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতও সেই-সব প্রবাদ শুনলেন।

অনেকেই বললেন, এই প্রবাদ যদি সত্যি হয় তাহ'লে বলতে হবে, ওখানে আগে কোন বিপুল সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল। মন্দির, প্রাসাদ, নগর নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে, কিন্তু এমন এক বিস্ময়কর সভ্যতার পিছনে কোন চিহ্ন না রেখে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে না। বনবাসে লুকিয়ে থাকতে পারে কেবল অসভ্যতাই।

কিন্তু চীনদেশের পুরাতন ঐতিহাসিক পুথি-পত্রেও কাম্বোজের এক আশ্চর্য্য সভ্যতার কাহিনী পাওয়া যায়!

Mouhot একজন ফরাসী ভদ্রলোকের নাম। তাঁর কৌতূহল জাগল। পলাতক এই সভ্যতাকে গ্রেপ্তার করার জন্যে গোয়েন্দার মতন তিনি বাঘ আর হাতীর মুল্লুকে প্রবেশ করলেন।

বাঘেরা জঙ্গলের ছায়ায় ব'সে, হাতীরা নদীর ধারে দাঁড়িয়ে এবং অজগরেরা গাছের ডালে ডালে ঝুলে প'ড়ে সবিস্ময়ে দেখলে, ওঙ্কারধামের অরণ্যে আধুনিক মানুষের মুখ।

ওঙ্কারধামের দক্ষিণ প্রবেশ পথের উপরে জেগে ছিল কালজয়ী প্রলয়-দেবতা শিবের চারিটি বিপুল মুখমণ্ডল, তাদের পাষাণ নেত্রের সামনে বহুযুগ পরে আবার ক্ষুদ্র মানুষের আবির্ভাব হ'ল!

বোবা পাথরের উপরে বিস্ময়ের শব্দ-রেখা ফুটল না বটে, কিন্তু যে অভাবিত কাহিনী বহন ক'রে Mouhot আবার আধুনিক সভ্য-জগতে ফিরে এলেন, দিকে দিকে তা চমকপ্রদ উত্তেজনার সৃষ্টি করলে...

"সেকালের পৃথিবীতে এক জাতি যখন আর এক জাতিকে আক্রমণ করত, পরাজিত জাতিকে তখন প্রায়ই দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হ'ত। তারা আবার নতুন দেশে গিয়ে সেখানকার বাসিন্দাদের তাড়িয়ে বা বশ ক'রে নতুন রাজ্য স্থাপন করত।

এইভাবে সেকালকার পৃথিবীতে অনেক নতুন রাজ্য গ'ড়ে উঠেছে এবং তাদের মধ্যে কোন কোন রাজ্য এখনো টিকে আছে।

সম্ভবত এই ভাবেই একদল হিন্দু ভারতবর্ষ ত্যাগ ক'রে সাগর পেরিয়ে শ্যামদেশে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। কত শতাব্দী আগে এখনো সেটা স্থির হয় নি।

তবে তেরো কি চৌদ্দ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাদের হাতে গড়া নতুন সভ্যতার অস্তিত্ব যে নষ্ট হয়নি, এমন কথা বলা যায়।

এই সভ্যতাব আশ্রয়ে যে এক সময়ে তিন কোটি মানুষ নিরাপদে বাস করত, সেটা অনুমান করবার মত প্রমাণেরও অভাব নেই।

ওঙ্কাবধাম ছিল তাদের রাজধানী। সে এত বড় নগর এবং তার ধ্বংসাবশেষ এতদূব পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে সেখানেও বোধ হয় বাস করত দশলক্ষ হিন্দু! আজ তাদের একজনও নেই, তাদের বংশধরদেরও সন্ধান মেলে না!

কিন্তু তাদেব মেঘ-ছোঁয়া মন্দির মহাকালকে পরিহাস ক'রে আজও বেঁচে আছে—যেমন বেঁচে আছে মৃত মিশরীদের পিরামিড!

ওঙ্কারধামের এই অদ্ভুত মন্দির শিল্পেব দিক দিয়ে পিরামিডেরও চেয়ে ঢের বড়, ঢের বিচিত্র, ঢের আশ্চর্য্য!

মানুষের হাত পৃথিবীর আর কোথাও এমন মন্দির গড়তে পারেনি। ভাবতে গর্ব হয় যে, এই মন্দির যারা গড়েছে তারা হচ্ছে দিগ্বিজয়ী হিন্দু—আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষ!

সুন্দরবাবু, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের সেই চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি স্বচক্ষে দেখলে আপনাকে স্তম্ভিত হ'তে হবে! মানুষের হাত যে এমন মন্দির গড়তে পারে এ-কথা আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না,—

মনে করবেন আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা ছিলেন মর্ত্তে অবতীর্ণ দেবতা!”

সুন্দরবাবু উত্তরে মনের মত কথা খুঁজে না পেয়ে কেবল বললেন, “হুম্!”

প্রথম গাড়িতে তখন মাণিক বলছিল, “জয়, কলকাতার অলি-গলিতে চ্যান্ আর ইন্ হয়তো এখনো আমাদের খুঁজে মরছে!”

জয়ন্ত ঘাড় নেড়ে বললে, “শত্রুদের যারা নিজেদের চেয়ে বোকা মনে করে, পদে পদে ঠকে মরে তারাই! খুব সম্ভব আমরা তাদের ফাঁকি দিয়ে ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে পারি নি।”

—“কিন্তু জয়, যে-জাহাজে আমরা এসেছি তার মধ্যে যে চ্যান্ আর ইন্ ছিল না, এটা আমি হলপ করে বলতে পারি। অমলবাবু তাদের চেনেন, জাহাজের আরোহীদের দলে তারা ছিল না।”

জয়ন্ত অন্যমনস্কের মত বললে, “হতে পারে। না হতেও পারে।”

ঠিক সেই সময়ে পিছন থেকে শোনা গেল একখানা মোটরের ভেঁপুর শব্দ!

জয়ন্ত সচমকে গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে দেখলে। সোজা রাস্তা—অনেক দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে।

জয়ন্তদের তিনখানা গাড়ী ঠিক পরে পরেই ছুটেছে।

কিন্তু আরো খানিকটা পিছনে দেখা দিয়েছে আরো দু'খানা নূতন মোটর গাড়ী! রাস্তার উপরে ধূলোর মেঘ সৃষ্টি ক'রে গাড়ী-দুখানা ছুটে আসছে যেন বিদ্যুৎবেগে!

মাণিক সবিস্ময়ে বললে, “এত বেগে ওরা কারা গাড়ী চালায়! ক্রমাগত হর্ণের পর হর্ণ দিয়ে ওরা আমাদের পথ ছেড়ে স'রে যেতে বলছে! ওদের এত তাড়াতাড়িই বা কিসের?”

পিছনের গাড়ী থেকে ব্যস্ত-স্বরে চেঁচিয়ে সুন্দরবাবু ব'লে উঠলেন, “পথ ছাড়ো, পথ ছাড়ো! নইলে এখনি অ্যাক্সিডেন্ট্ হবে!”

জয়ন্ত নিজেদের ড্রাইভারকে বললে, “গাড়ী নিয়ে একপাশে স'রে যাও। গাড়ী একেবারে থামিয়ে ফ্যালো।”

ড্রাইভার তার কথামত কাজ করলে। তাদের অন্য গাড়ী-দুখানাও পথের একপাশে গিয়ে থেমে দাঁড়াল।

গাড়ীর দরজা খুলে জয়ন্ত পথের উপর নেমে পড়ল। তারপর নিজের কোমরবন্ধে সংলগ্ন রিভলভারের উপর হাত রেখে পিছনদিকে দৃষ্টিপাত করলে, তার দুই চক্ষু প্রদীপ্ত, মুখে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ভাব!

ধূলোর মেঘে ঢাকা দুখানা গাড়ী তার অজ্ঞাত আরোহীদের নিয়ে প্রচণ্ড বেগে খুব কাছে এসে পড়েছে!

মহাকালের অভিশাপ

জয়ন্তের পাশে দাঁড়িয়ে মাণিক বললে, "জয়, তুমি কি মনে কর, ও গাড়ী দুখানার মধ্যে আমাদেব শত্রু আছে ?"

জয়ন্ত বললে, "শত্রু-মিত্র জানিনা, আমি কেবল সতর্ক হয়ে থাকতে চাই।"

জয়ন্তের মুখের কথা শেষ হবার আগেই ভোঁ ভোঁ ভোঁ ভোঁ ক'রে ক্রমাগত হর্ণ বাজাতে বাজাতে প্রথম মোটরখানা তীব্র-গতিতে সাঁৎ ক'রে তাদের চোখের সুমুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল এবং পরমুহূর্ত্তেই দ্বিতীয় গাড়ীখানা! গাড়ী তো নয়, যেন দু-দুটো অগ্নিহীন উল্কা, সে প্রচণ্ড গতির ঝড়ের ভিতর থেকে চেনা বা অচেনা কোন মানুষের মুখই আবিষ্কার করা গেল না!

সুন্দরবাবু বললেন, "মেল-ট্রেণের স্পীডও এদের কাছে বোধ হয় হার মানে! কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এরা কেন যাচ্ছে আর কোথায়ই বা যাচ্ছে ?"

পথের ধূলোর দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বললে, "যেখানেই যাক, ওরা আমাদের ফাঁকি দিতে পারবে না। আমরা ওদের নাগাল ধরবই।"

সুন্দরবাবু বললেন, "নাগাল ধরবে মানে ? ওদের নাগাল ধরতে গেলে আমাদেরও তো ওদের চেয়ে বেশী জোরে গাড়ী ছোটাতে হয়! হুম্, আমি তাতে মোটেই রাজি নই! গাড়ী যদি একবার হোঁচট খায়, তাহ'লে ওঙ্কারধাম দেখবার আগেই গোলোকধামে গিয়ে হাজির হ'তে হবে!"

জয়ন্ত রূপোর নস্যদানি থেকে একটিপ নস্য নিয়ে বললে, "ছেলেবেলায় কচ্ছপ আর খরগোসের গল্প পড়েন নি? কচ্ছপ দৌড়ে খরগোসকে শেষে হারিয়ে দিয়েছিল। আমরা গাড়ীর স্পীড না বাড়িয়েও ওদের নাগাল ধরব। পথের দিকে তাকিয়ে দেখুন। ধূলোর ওপরে গাড়ীর চাকার দাগ দেখতে পাচ্ছেন না?"

সুন্দরবাবু বললেন, "ও হো হো হো বুঝেছি! ঐ দাগ ধ'রে আমরা ওদের পিছু নিতে পারব, তুমি এই বলতে চাও তো?"

অমলবাবু বললেন, "কিন্তু ওদের পিছু নেবার দরকারই বা কি?"

জয়ন্ত বললে, "দরকার একটু আছে বৈকি! এমন মারাত্মক স্পীড্ নিয়ে যারা আমাদের পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে চায়, তাদের নিয়ে মাথা না ঘামালে চলবে কেন!"

অমলবাবু ভীতকণ্ঠে বললেন, "আপনি কি বলতে চান, ঐ গাড়ী দু'খানার মধ্যে চ্যান্ আর ইন্ আছে?"

—"চ্যান্‌কেও চিনি না, ইন্‌কেও চিনি না, এখন উঠুন গাড়ীতে!"—এই ব'লে জয়ন্ত নিজের গাড়ীর ভিতরে গিয়ে ব'সে পড়ল। আর সকলেও তখন তার অনুসরণ করলে, গাড়ী তিনখানা অবার অগ্রসর হতে লাগল।

জয়ন্ত প্রথম গাড়ীর ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসল, পূর্ব্ববর্ত্তী গাড়ীগুলোর চক্রে চিহ্নিত পথের উপরে দৃষ্টি রাখবার জন্যে।

মাণিক সামনের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে বললে, "আচ্ছা জয়, যারা গেল্ তারা যদি চ্যানের দল হয় তবে তারা আমাদের আক্রমণ না ক'রে এগিয়ে গেল কেন? আর শত্রুরা সঙ্গে-সঙ্গেই ভারতবর্ষ ছেড়ে এখানে এলই বা কি ক'রে? আমাদের জাহাজে তারা তো ছিল না!"

জয়ন্ত বললে, "চ্যান্ আর ইন্ হয়তো এখনো এখানে এসে পৌঁছতে পারে নি, কিন্তু মাণিক, তুমি ভুলে যেওনা যে এটা হচ্ছে

বিংশ শতাব্দী! চ্যানের টেলিগ্রাম হয়তো আমাদের আগেই কালাপানি পার হয়েছে!"

—"জয়, তুমি কি বলতে চাও, চ্যানের কোন টেলিগ্রাম পেয়ে তার দলের লোকেরা আমাদের পিছু নিয়েছে?"

—"হতেও পারে, না হতেও পারে! হয়তো ওরা হুকুম পেয়েছে আমাদের উপরে পাহারা দেবার জন্যে! ওঙ্কারধামে যাবার প্রধান রাস্তা হচ্ছে এইটিই। হয়তো ওরা এগিয়ে গেল আমাদের পথ আগ্‌লে থাকবার জন্যে।"

গাড়ী ছুটছে! দু'ধারে সেই সবুজ ক্ষেত, আর মাঝখানে সেই সোজা রাঙা রাস্তা।

মাণিক বললে, "দূরে একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে।"

ড্রাইভার বললে, "হ্যাঁ, ওর নাম সিয়েম্ রিপ্। আর মাইল খানেক পরেই আমরা ডাকবাংলোয় গিয়ে পৌঁছব।"

সিয়েম্ রিপ্ গ্রাম থেকে উত্তর-দিকে মোড় ফিরতেই চোখের সামনে জেগে উঠল, বিরাট ওঙ্কারধামের বিপুল দেবালয়!

চারিধারের নিবিড় জঙ্গল ও সুদীর্ঘ বনস্পতিরা ওঙ্কারধামের পঞ্চ-চূড়ার অনেক নীচে প'ড়ে রয়েছে।

দূর থেকে ওঙ্কারধামকে দেখে মনে হ'ল, বিরাটতায় সে মিশরের পিরামিডের চেয়ে এবং সূক্ষ্ম শিল্পের নিদর্শন রূপে সাজাহান বাদসার তাজমহলের চেয়ে খাটো নয়! এই অরণ্যের মধ্যে হঠাৎ তাকে দেখলে তার বাস্তবতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়।

এ যেন আলাদীনের প্রদীপবাহী দৈত্যের হাতে-গড়া কোন অসম্ভব মায়ামন্দির, যে-কোন মুহূর্তে দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে শূন্যে মিলিয়ে যেতে পারে!

ওঙ্কারধামের ছায়ায় এসে দেখা গেল, তাদের অগ্রবর্ত্তী সেই গাড়ীদু'খানার চাকার দাগ বাংলো ছাড়িয়েও এগিয়ে গিয়েছে।

সুন্দরবাবু সর্ব্বপ্রথমেই ডাক-বাংলোয় ঢুকে একটা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "হুম্, এইবারে আহার আর বিশ্রাম!"

জয়ন্ত বললে, "আপাততঃ আমাকে ও-দুটি সুখ থেকেই বঞ্চিত হয়ে থাকতে হবে। আগে বাংলোর চারিদিকটা তদারক না ক'রে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি না!"

মাণিক বললে, "কিন্তু এখানে তদারক করবার কিছু আছে ব'লেই মনে হচ্ছে না। চারিদিক শান্তিময়, শত্রুদের কোন চিহ্নই নেই।"

"হ্যাঁ, ঝড়ের আগে প্রকৃতি খুব শান্ত থাকে বটে—" মৃদুস্বরে এই কথা ব'লেই জয়ন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অমলবাবু বললেন, "এই ওঙ্কারধাম আমার পুরণো বন্ধুর মত। মাণিক, আগে আমি মন্দিরের সঙ্গে আলাপ ক'রে আসতে চাই।"

মাণিক বললে, "এই অদ্ভুত মন্দির আমারও কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছে! চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাই।"

অগ্রসর হ'তে হ'তে অমলবাবু অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে যেন সুদূর অতীতের দিকে তাকিয়েই যে কাহিনী বর্ণনা করলেন তা হচ্ছে এই:

অস্তলোক থেকে পূর্ব্ব-আকাশের গায়ে ছবির মতন আঁকা নীলপাহাড়ের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে যাত্রীর পর যাত্রী—যেন তাদের আর শেষ নেই!

চলেছেন রাজা আর রাজপুত্ররা সাজানো হস্তীদলের পৃষ্ঠে। চলেছেন রাজপুরোহিতগণ সোনার রথে চ'ড়ে! চলেছেন বীরবৃন্দ ও সৈনিকগণ তেজীয়ান অশ্বদের উপরে ব'সে! চলেছে সভাসদ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, কর্ম্মচারী, সওদাগর ও ধনী দীন প্রজার দল যথাযোগ্য যানবাহনে বা পদব্রজে! চলেছে রুগ্ন ও ভিখারীর দল অরণ্যের ভিতর দিয়ে, অনুর্ব্বর ক্ষেত্রের উপর দিয়ে বা সন্ন্যাসীর গায়ে-মাখানো শুক্‌নো ভস্মের মত সাদা ধূলোয় ভরা উঁচু-নীচু পথ মাড়িয়ে; —তাদের কোন সম্পদ নেই; তবু তারাও পিছনে প'ড়ে থাকতে

রাজী নয়, কারণ তাদের মনে মনে জ্বলছে উজ্জ্বল আশার অম্লান বাতি! হাজারের পর হাজার, লক্ষের পর লক্ষ লোক চলেছে, এগিয়ে চলেছে!

কত লোকের দেহ পড়েছে এলিয়ে, পায়ে পড়েছে ফোস্কা, তবু তারা এগিয়ে চলেছে। পথের মাঝে জাগছে পাগ্‌লীনদীব ক্রুদ্ধ ঢেউ, দুরারোহ শৈলের দর্পিত শিখর, দুর্গম বনের জ্বালাময় কণ্টক-প্রাচীর, তবু তারা সব পেরিয়ে চলেছে এগিয়ে—মুখে মুখে জাগিয়ে তুলে কবি-ঋষিদেব রচিত পবিত্র মন্ত্রসঙ্গীত! কত শত মানুষের অক্ষম ভগ্ন দেহ জনহীন অনন্ত পথের উপর লুটিয়ে পড়ল, তবু তাদের আত্মা এগিয়ে চলল সেই বিপুল বাহিনীর পিছনে পিছনে!······

কিছুদিন পরে দিনের রোদে আর রাতের জোছনায় দেখা গেল, সেই নির্জ্জন নিস্তব্ধ নির্দ্দয় পথ জুড়ে প'ড়ে রয়েছে মাংসহীন নরকঙ্কালের পর নরকঙ্কাল,—জীবনের যাত্রাপথে যে-সব অভাগা এগিয়ে যেতে পারলে না, তাদেবই শেষ-চিহ্ন!

যারা এগিয়ে গেল আর যারা এগিয়ে যেতে পারলে না, তারা প্রত্যেকেই হচ্ছে ভারতসন্তান!

হিমালয়ের আশ্রয় ছেড়ে, গঙ্গার স্নিগ্ধ স্পর্শ ভুলে, সাগর পার হয়ে ব্রহ্মদেশের নিবিড় অরণ্য ভেদ ক'রে রাজা-প্রজা, পুরুষ-নারী মা-ছেলে, বর-বউ, কুমার-কুমারী এইখানে এসে অবশেষে কাম্য-লোকের সন্ধান পেলে—আজ আমরা যে পবিত্র ভূমির উপর দিয়ে পদচারণ করছি! সে হচ্ছে শত শত যুগ আগেকার কথা, স্বাধীন ভারতবর্ষে তখনো কোন বিধর্ম্মী প্রবেশ করতে সাহসী হয় নি। খুব সম্ভব তারা যে দেশ থেকে এসেছিল আজ আমরা তাকে মাদ্রাজ ব'লে জানি।

ওঙ্কারধামের পাথরে পাথরে তারা যে সংস্কৃত ভাষার লিপি খুদে গেছে, তাই দেখেই এই সত্য জানা যায়। ওঙ্কারধামের অসংখ্য মূর্ত্তিও তাদের মৌন ভাষায় আর এক নিশ্চিত সত্য প্রকাশ করবে:

যাদের শিল্পনিপুণ হাত তাদের গড়েছে তারা প্রথমে ছিল হিন্দু, তারপর বৌদ্ধ।

এইখানে গহনবন কেটে তারা বিপুল সভ্যতা ও বিরাট নগর আর দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিল।

তাদের হাতের অমর চিহ্ন আজও প্রায় অটুট হয়েই আছে! ভারতের গান্ধার, সারনাথ বা কোণারকের মত এখানে আমরা কোন প্রাচীন শিল্পকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাব না, ওঙ্কারধামের শত শত শিলাচিত্র, হাজার হাজার দেবতাদানব মানব ও পশুর মূর্ত্তি আজও সম্পূর্ণ গৌরবে বিরাজ করছে।

এখানকার প্রাচীর ও দেওয়ালগুলি দেখলে সন্দেহ হবে, বয়সে তারা মোটেই পুরাতন নয়, সেকালে তারা যেমন শক্ত আর নিরেট ছিল আজও সেই রকমই আছে! বৃষ্টির জল আজও ছাদ ফুটো করতে পারে নি!

······মনে হয়, এই ঘণ্টাকয়েক আগেই যেন জীবন্তদের কল-কোলাহলে ছিল চারিদিক পরিপূর্ণ হয়ে—দেবদাসীরা পায়ের নুপুর খুলে যেন এই সবে প্রণাম ক'রে বিদায় নিয়ে গেছে, পুরোহিত মন্ত্র প'ড়ে পূজো সেরে এই সবে যেন চেখের অন্তরালবর্ত্তী হয়েছেন, ধূপধূনো অগুরুর গন্ধ যেন আর একটু আগে এখানে এলেই পাওয়া যেত!

ঐতিহাসিকরা বলেন, এক সময়ে ওঙ্কারধামের মতন বড় সহর সারা পৃথিবী খুঁজলেও পাওয়া যেত না।

নবম শতাব্দীর প্রথমে ভারত-শিল্পী যখন এই সহরকে সম্পূর্ণ ক'রে তুলেছিলেন, তখন য়ুরোপের যে কোন নগর এর কাছে মাথা হেঁট করতে বাধ্য হ'ত!

এথেন্স, রোম, কার্থেজ ও বাবিলন প্রভৃতি বিখ্যাত ও অমর নগর তাদের উন্নতির দিনেও যে ওঙ্কারধামের চেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল, এমন মনে করবার মত প্রমাণ নেই!

কিন্তু গভীর জঙ্গল আর হিংস্র পশুদের কবলে এত যত্নে গড়া মন্দির আর রাজধানীকে নিক্ষেপ ক'রে কোথায় গেল সেই ভারতীয় রাজা, যোদ্ধা, সওদাগর আর শিল্পীর দল? কোথায় গেল সেই সাগরপারে প্রবাসী ভারতীয় সভ্যতা?

আজকের বোবা ওঙ্কারধাম সে প্রশ্নের কোন উত্তর দেয় না। কেবল মনে হয়, এই ঘণ্টাকয়েক আগে যারা এখান থেকে চ'লে গিয়েছে যে-কোন মুহূর্তেই তারা আবার ফিরে এসে মন্দির আর নগর পুনরধিকার করতে পারে!

অবাক হয়ে অতীত-ভারতের এই ইতিহাস শুনতে শুনতে মাণিক পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

সূর্য্য তখন সুদূর অরণ্যের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে—পশ্চিম-আকাশের মায়াপুরীর রঙিন কিরণমালা তখনো দুলছে হাল্‌কা মেঘে।

ওঙ্কারধামের পদ্ম-ফোটা খালের ঝিল্‌মিলে জলে, বট আর নারিকেল-কুঞ্জের ভিড়ে ক্রমেই বেশী ক'রে জ'মে উঠছে আসন্ন সন্ধ্যার ঘনচ্ছায়া!

বিভিন্ন দল বেঁধে ছোট ছোট মেঘের মত ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীরা আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে বাসার দিকে এবং তাদের কলধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে কাণে আসছে দূরের মন্দির-গর্ভ ভেদ ক'রে আধুনিক বৌদ্ধ পুরোহিতদের গম্ভীর মন্ত্র-ছন্দ! শুনলে আত্মা শিউরে উঠে,—এ কি বিংশ শতাব্দীর কণ্ঠরব, না বহুযুগের ওপারে ব'সে ওঙ্কারধামের গৌরবের দিনে একদিন যারা এখানে উদাত্ত স্বরে স্তবপাঠ করত, তারই সুদীর্ঘ প্রতিধ্বনি আজও বেজে বেজে উঠছে মন্দিরের শিলায় শিলায়, অন্ধকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে?

মাণিক হঠাৎ মুখ তুলে সবিস্ময়ে দেখলে, তার সুমুখেই জেগে উঠেছে আশ্চর্য্য ও বিচিত্র এক নগর-তোরণ! দেখেই সে চিনতে পারলে, কারণ এই বিখ্যাত তোরণের বহু চিত্র সে ইংরেজী কেতাবে

এর আগেই দেখেছে! কিন্তু এর আসল ভাবের কোন আভাস ছবিতে কেউ ফোটাতে পারে নি।

খুব উঁচু সেই নগর-তোরণ, তার দ্বারপথ দিয়ে অনায়াসে বড় বড় হাতী আনাগোনা করতে পারে এবং তার উপরে জেগে রয়েছে চারিদিকে চারিটি বিরাট শিবের মুখ! এমন বৃহৎ শিবের মুখ মাণিক জীবনে কোনদিন দেখে নি!

ওঙ্কারধামের একজন হিন্দু রাজা একখানি শিলালিপিতে এই নগরকে "প্রবলপরাক্রান্ত ও ভয়াবহ" ব'লে বর্ণনা ক'রে গেছেন। এখানকার হিন্দুরা জীবনধারণ করত তরবারির সাহায্যেই। তাদের স্থাপত্যেও প্রকাশ পেয়েছে সেই প্রচণ্ড ভাবই! কারণ বাহির থেকে ভিতরে ঢুকতে গেলেই শিবের যে প্রকাণ্ড মুখখানি দেখা যায়, তা ভয়ানক বটে,—সে যেন আগন্তুককে বলতে চায়, সাবধান! পূর্ব ও পশ্চিমদিকের মুখদুখানি যেন অনন্তের ধ্যানে আত্মহারা। এবং তোরণের ভিতরদিক থেকে যে মুখখানি নগরের দিকে তাকিয়ে আছে, তার ভিতর থেকে যেন আশীর্ব্বাদ ও বরাভয়ের ভাব আবিষ্কার করা যায়!

প্রলয়-কর্ত্তা শিবকে নগররক্ষীরূপে নির্ব্বাচন ক'রে ওঙ্কারধামবাসী ভারতীয়রা উচিত কার্য্যই করেছে। কারণ, বারে বারে তারা যখন দিগ্বিজয়ে যাত্রা করত পৃথিবীর বুক ভেসে যেত তখন শোণিত প্রবাহে!

প্রলয়-দেবতার প্রীতির জন্যে লক্ষ লক্ষ শত্রুর প্রাণবলি দিয়ে অবশেষে তারা নিজেরাও পাষাণ দেবতার পায়ে আত্মদান ক'রে চির বিদায় নিয়ে গিয়েছে। তাদের স্মৃতির শ্মশানে শেষ পর্য্যন্ত আজ জেগে আছেন কালজয়ী এবং চির-একাকী প্রলয়-দেবতাই!

অমলবাবু তোরণের উপরদিকে শিবের ভয়াল মুখের পানে তাকিয়ে ভয়ে-ভয়ে নমস্কার ক'রে বললেন, "হে মহাদেব, তুমি কেবল লয়কর্ত্তা নও, সৃষ্টি করাও তোমার কাজ! অবোধ প্রাণী আমরা,

লোভে অন্ধ হয়ে তোমার আশ্রয়ে ছুটে এসেছি ব'লে আমাদের অপরাধ নিও না প্রভু, আমাদের তুমি রক্ষা কোরো!"

মাণিক হেসে বললে, "এই পাথরে গড়া জড়দেবতার যদি রক্ষা করবার শক্তি থাকত, তাহ'লে ওঙ্কারধাম আজ শ্মশান হয়ে যেত না!"

অমলবাবু ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, "মাণিকবাবু, তীর্থক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অমন কথা বলবেন না, এখনি সর্ব্বনাশ হবে।"

মাণিক বললে, "সর্ব্বনাশ যদি হয়, তাহ'লে ঐ পাথরের দেবতার জন্যে নিশ্চয়ই হবে না, আমাদের নিজেদের বুদ্ধির ভুলেই হবে!"

মাণিকের মুখের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আসন্ন সন্ধ্যার কালিমাখা স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ ক'রে আচম্বিতে জেগে উঠল একটা বন্দুকের শব্দ ও তীব্র আর্ত্তনাদ! তারপরেই আবার বন্দুকের শব্দ!

অমলবাবু ও মাণিকের সচকিত দৃষ্টি পরস্পরের মুখের দিকে ফিরল!

মাণিক ত্রস্ত স্বরে বললে, "শব্দগুলো এলো বাংলোর দিক থেকে!" ব'লেই সে বেগে ডাক-বাংলোর দিকে ছুটে চলল—তার পিছনে অমলবাবু!

বাংলোর হাতার মধ্যে ঢুকেই দেখা গেল, সুন্দরবাবু খুব ব্যস্তভাবে একটা বন্দুক নিয়ে ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছেন!

মাণিক তাড়াতাড়ি সুধোলে, "এখানে বন্দুক ছুঁড়লে কে? আর্ত্তনাদ করলে কে?"

সুন্দরবাবু বললেন, "আমিও তোমাদের ঠিক ঐ কথাই জিজ্ঞাসা. করতে চাই?"

—"জয়ন্ত কোথায়?"

—"সে তো এইখানেই ঘোরাঘুরি করছিল!"

মাণিক চীৎকার ক'রে ডাকলে, "জয়ন্ত! জয়ন্ত!"

কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

মাণিক বললে, "সুন্দরবাবু, আপনি ঐদিকে গিয়ে খুঁজুন! অমলবাবু আপনি ঐদিকে যান! আমি এইদিকটা খুঁজে দেখছি!"

তিনজনে তিনদিকে ছুটল। সন্ধ্যা তখনো মানুষের চোখ অন্ধ করবার মত অন্ধকার সৃষ্টি করেনি—শেষ পাখীর দল তখনো বাসায় ফিরছে! কিন্তু মন্দিরের বৌদ্ধ পুরোহিতের কণ্ঠ আর শোনা যাচ্ছে না, নীরবতার মাঝখানে ছন্দ সৃষ্টি করছে কেবল তরুপল্লবের দীর্ঘশ্বাস!

হঠাৎ সুন্দরবাবুর ভীতকণ্ঠস্বর শোনা গেল—"মাণিক! অমলবাবু! এইদিকে এইদিকে!"

মাণিক সেইদিকে ঝড়ের মতন ছুটে গিয়ে দেখলে, একটা গাছের তলায় সুন্দরবাবু হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর হাতে রয়েছে একটা সোলার টুপী!

"কি সুন্দরবাবু, ডাকলেন কেন?"

"হুম্, এ কি কাণ্ড। জয়ন্তের টুপী এখানে প'ড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছিল, কিন্তু জয়ন্ত কোথায়?"

ততক্ষণে অমলবাবুও আর একদিক দিয়ে ছুটে আসতে আসতে হঠাৎ একজায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে প'ড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "এখানে এত রক্ত কেন?"

মাণিক উদ্ভ্রান্তের মত আবার সেইদিকে দৌড়ে গেল। আড়ষ্ট চোখে দেখলে, সেখানকার মাটি রক্তে যেন ভেসে যাচ্ছে!

সে প্রায় অবরুদ্ধ স্বরে বললে, "এ কার রক্ত?"

সুন্দরবাবু বললেন, "কিন্তু জয়ন্ত কোথায়?

অমলবাবু মাথায় হাত দিয়ে ব'সে প'ড়ে বললেন, "মহাকালের অভিশাপ! মাণিক তোমার নাস্তিকতার ফল দেখ!"

পাথরের
সিনেমা *

আরো অনেক ডাকাডাকির পরেও জয়ন্তের সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

ততক্ষণে গোলমাল শুনে অমলবাবুর দ্বারবান হাতী সিং ও দলের অন্যান্য চাকর-বাকররাও এসে পড়েছে।

সন্ধ্যার আবির্ভাবেও অন্ধকার সেখানে গাঢ় হ'তে পারলে না, কারণ কয়েকটা পেট্রলের লণ্ঠনের প্রখর আলোকে চারিদিক সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু বনজঙ্গল ঠেঙিয়েও শত্রু বা মিত্র জনপ্রাণীরও সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল না।

সুন্দরবাবু হতাশ ভাবে কাঁচুমাচু মুখে বললেন, "হায় হায়, মগের মুল্লুকে এসে জয়ন্ত শেষটা প্রাণ হারালো!"

মাণিক মাথা নেড়ে বললে, "আমার বন্ধু এত সহজে কাবু হবার ছেলে নয়। জয়ন্ত হয়তো এখনি ফিরে আসবে!"

অমলবাবু বললেন, "আমার তা মনে হয় না। দু-দু'বার বন্দুকের আওয়াজ হ'ল কেন? ওখানে রক্তে মাটি ভিজে কেন?"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্! আর ওখানে জয়ন্তের টুপীটা গড়াগড়ি যাচ্ছে কেন?"

মাণিক বললে, "দেখা যাক, জয়ন্তের পদ্ধতিতেই কোন রহস্য আবিষ্কার করা যায় কিনা!"

---

* ওঙ্কারধাম সম্বন্ধে এ উপন্যাসে যা বলা হয়েছে তা লেখকের কপোলকল্পিত নয়। অধিকাংশই প্রমাণিত ঐতিহাসিক সত্য। ইতি লেখক।

যেখানে টুপীটা প'ড়ে ছিল সেইখানে গিয়ে সে আগে টুপীটা তুলে নিলে।

পরীক্ষা করতে গিয়ে প্রথমেই সভয়ে দেখলে, টুপীর দুদিকে দুটো ফুটো—বন্দুকের গুলি একদিক দিয়ে ঢুকে অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে এবং টুপীর ভিতরেও রক্তের দাগ! সেখানকার মাটির উপরেও রক্তের দাগ দেখা গেল!

মাণিক নিরাশ কণ্ঠে বললে, "আর কিছু পরীক্ষা করা মিছে! জয়ন্তের মাথায় লেগেছে শত্রুর গুলি।"

অমলবাবু বললেন, "তাহ'লে গুলি খেয়ে জয়ন্তবাবু কি পালিয়ে গিয়েছেন?"

—"জয়ন্তের মতন সাহসী লোক খুব কম দেখা যায়। সে পালাবে ব'লে মনে হয় না।"

অমলবাবু বললেন, "দশজন্ সশস্ত্র লোক একজনকে যখন হঠাৎ আক্রমণ করে, তখন যে পালাতে রাজি হয় না তাকে সাহসী না ব'লে নির্ব্বোধ আর গোঁয়ার বলাই উচিত। জয়ন্তবাবু নিশ্চয়ই এ-শ্রেণীর লোক নন।"

—"সে কথা সত্যি। কিন্তু তাহ'লেও এতক্ষণে সে ফিরে আসত।"

—"এখানে জয়ন্তবাবুও নেই, শত্রুরাও নেই। যদি তারা তাঁর পিছনে পিছনে ছুটে থাকে?"

—"অসম্ভব নয়। কিন্তু জয়ন্তকে ধ'রেও শত্রুরা বিশেষ সুবিধা ক'রে উঠতে পারবে না। কারণ সেই সোনার চাকতিখানা তার কাছে আছে বটে, কিন্তু চাবিকাঠি আছে আমার কাছে। জয়ন্তের পরামর্শেই এই ব্যবস্থা হয়েছে। একজন ধরা পড়লে একসঙ্গে দুটো জিনিষ চুরি যাবে না।"

সুন্দরবাবু বললেন, "এখানে রয়েছে জয়ন্তের রক্তমাখা টুপী, মাটির উপরেও রক্তের দাগ! কিন্তু ওখানে অত দূরেও মাটির উপরে রক্তের ঢেউ বইছে! আমার কি ভয় হচ্ছে জানো মাণিক?"

—"কি ভয় হচ্ছে ?"

—"আমরা দুবার বন্দুকের আওয়াজ শুনেছি। ধর, জয়ন্ত জানতে পারবার আগেই শত্রুর প্রথম গুলিতে আহত হয়ে এইখানে প'ড়ে যায় আর তার টুপীটা যায় মাথা থেকে খুলে। কিন্তু আহত হয়েও সে তাড়াতাড়ি আবার উঠে ঐদিক দিয়ে পালাবার চেষ্টা করে, তাই এখানে রক্তের দাগ এত কম। সে যখন ঐখানে গিয়ে পৌঁছেচে তখন শত্রুদের দ্বিতীয় গুলি আবার তাকে মাটির উপরে পেড়ে ফেলে, আর তার রক্তের ধারায় মাটি যায় ভিজে। তারপর হয় সে অজ্ঞান হয়ে গেছে, নয়—ভগবান না করুন—মারা পড়েছে! কারুর দেহ থেকে অত-বেশী রক্ত বেরুলে তার পক্ষে বাঁচা অসম্ভব, দীর্ঘকাল পুলিসে কাজ ক'রে এ-অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে! মাণিক, খুব সম্ভব আমাদের বন্ধু আর বেঁচে নেই!"

গভীর দুঃখে সুন্দরবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তাঁর চোখ দুটি ছল-ছল করতে লাগল!

অমলবাবু আকুলকণ্ঠে বললেন, "কিন্তু জয়ন্তবাবুর দেহ কোথায় গেল ?"

সুন্দরবাবু বললেন, "নিজেদের বিরুদ্ধে প্রমাণ লুকোবার জন্যে শত্রুরা জয়ন্তের দেহ সরিয়ে ফেলেছে।"

ওঙ্কারধামের মন্দির-চূড়াকে তখন রহস্যময় আকাশের বিরাট পটে কালি-দিয়ে আঁকা ছবির মত দেখাচ্ছে এবং জঙ্গলের বোবা অন্ধকারের মুখে ভাষা দিয়ে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে নৈশ জীবদের নানারকম কলরব, গাছে গাছে পাতায় পাতায় বাতাসের নিঃশ্বাস-উচ্ছ্বাস।

মাণিক খানিকক্ষণ স্তব্ধ মূর্ত্তির মত ব'সে থেকে হঠাৎ পাগলের মত চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল, "প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—আমি প্রতিশোধ চাই!"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্! আমারও ঐ কথা! এখন আর

পদ্মরাগ-বুদ্ধের খোঁজ নয়, আগে খুঁজে বার করতে হবে জয়ন্তের হত্যাকারীদের !”

অমলবাবু বললেন, “কিন্তু কোথায় তারা ?”

মাণিক বললে, “অমলবাবু, যে ভাঙামন্দিরের ভিতর থেকে আপনি বুদ্ধমূর্ত্তিটা এনেছিলেন, সেখানে যাবার পথ আপনার মনে আছে তো ?”

—“নিশ্চয়ই আছে !”

—তাহ'লে তল্পিতল্পা গুছিয়ে নিয়ে এখনি চলুন সেইদিকে !”

—“তবে কি এখন হত্যাকারীদের সন্ধান করা হ'বে না ?”

—“অমলবাবু, হত্যাকারীরা যদিও চাবিটা পায় নি, কিন্তু চাক্তির নক্সা তো পেয়েছে ! তারা এখন সেই মন্দিরের দিকেই যাবে। ঐদিকে গেলেই তাদের খোঁজ পাব।”

—“কিন্তু আমরা যখন সেখানে গিয়েছিলুম তখন চ্যান্ আর ইন্‌কে তো সঙ্গে নিয়ে যাইনি, মন্দিরে যাবার পথ হয়তো তারা জানে না।”

—“এটা আপনার ভুল বিশ্বাস। পদ্মরাগ-বুদ্ধের কথা আর মন্দিরের পথ হয়তো তারা আপনার আগে থাকতেই জানত—জানত না কেবল পদ্মরাগ-বুদ্ধের ঠিকানা। নক্সা পেয়ে তারা এখন সদলবলে সেইদিকেই ছুটে চলেছে !”

সুন্দরবাবু বললেন, “মাণিকের কথাই যুক্তিসঙ্গত ব'লে মনে হচ্ছে। চল, চল,—আর দেরি করা নয়, যত দেরি করব শত্রুরা ততই এগিয়ে যাবে ! আগে প্রতিহিংসা, তারপর শোক-দুঃখের কথা ! তাড়াতাড়ি পেটে ছাইভস্ম কিছু পুরে আমাদের এখনি যাত্রা করতে হবে !”

সবাই যখন শত্রুদের সন্ধানে যাত্রা সুরু করলে, আকাশে তখন অপরিপূর্ণ চন্দ্র জেগে চারিদিকে যেন ছায়ামাখা আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে !

ডাকবাংলোর ছাদে একটা প্যাঁচা বসেছিল, হঠাৎ এতগুলো লোক দেখে ভয়ে চ্যাঁ-চ্যাঁ করে চেঁচিয়ে শূন্যে ঝট্‌পট্‌ ডানা বাজিয়ে উড়ে পালাল।

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্—পথে পা বাড়াতে না বাড়াতেই প্যাঁচার ডাক! দুর্গা, দুর্গা!"

মাণিক দুঃখিত স্বরে বললে, "জয়ন্তকে যখন হারিয়েছি, তুচ্ছ প্যাঁচার ডাকে আমাদের আর কি অনিষ্ট হবে সুন্দরবাবু?"

—"যা বলেছ মাণিক! জয়ন্ত যে আমাদের কতখানি ছিল এখন সেটা বুঝতে পারছি! আজ আমরা তাকে হারিয়ে চলেছি যেন নাবিকহীন জাহাজের মত! কপালে এও ছিল—হুম্!"

এবারে আর ঝাপ্‌সা আকাশপটে নয়, চাঁদের ছটা পিছনে রেখে ওঙ্কারধামের পঞ্চচূড়া অন্ধকারে-গড়া পঞ্চ-স্তম্ভের মত মহাশূন্যের বুক বিদীর্ণ করছে! এখন তাকে কি অবাস্তবই দেখাচ্ছে!

অতীতের একটা বিলুপ্ত জাতির সমস্ত সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার সমাধি-মন্দির এই ওঙ্কারধাম। তার বিপুল ছায়ার তলায় লক্ষ লক্ষ মানুষের দেহ মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে আজও বিদ্যমান রয়েছে—তারই উপর দিয়ে লণ্ঠনের আলোতে চলন্ত ও সুদীর্ঘ কৃষ্ণচ্ছায়ার সৃষ্টি ক'রে হেঁটে যাচ্ছে আজ বিংশ শতাব্দীর কয়েকটি প্রাণী! একদিন এইখান দিয়ে হেঁটে বা রথে বা গজপৃষ্ঠে বা অশ্বারোহণে বীরদর্পে ধনুক-বর্শা-তরবারি হাতে ক'রে দলে দলে হাজার হাজারে এগিয়ে গিয়েছিল যে স্বাধীন ভারতের ছেলেরা, তাদের সঙ্গে তুলনা করলে তাদের স্বগোত্র এই লোকগুলিকে কত অসহায়, কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছ ব'লেই মনে হয়!

দূর-গ্রামে কাদের সব দামামা বাজছে এবং তাদের প্রতিধ্বনি ফিরে আসছে ওঙ্কারধামের গগনস্পর্শ শিখরে প্রতিহত হয়ে।

সকলে তখন একটি পাথরে গড়া প্রকাণ্ড চত্বরের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল!

অমলবাবু যেন আপন-মনেই বললেন, "রাজা ইন্দ্রবর্ম্মণের পুত্র যশোবর্ম্মণ ছিলেন একজন মহামানুষ! তাঁর দেহ ছিল দানবের মতন প্রকাণ্ড, জনতার অনেক উচ্চে জেগে থাকত তাঁর গর্ব্বিত মাথা! আর তাঁর বলবীর্য্যও ছিল অসাধাবণ! তিনি নাকি নিরস্ত্র হয়েও খালি হাতে হস্তী ও ব্যাঘ্র সংহার করেছিলেন!

তাঁব কীর্ত্তিও তেমনি অতুলনীয়! সিংহাসনে আবোহণ ক'রে মাত্র এগাবো বৎসরের ভিতরেই এখানকার বিরাট নগর গ'ড়ে সম্পূর্ণ ক'বে ফেলেছিলেন, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগেও যা অসম্ভব বলেই মনে হয়!

আমরা এখন যেখান দিয়ে যাচ্ছি, এইখানেই মহারাজ যশোবর্ম্মন যে-বীবত্ব আর অসমসাহসিকতাব পবিচয় দিয়েছিলেন, তা অমানুষিক বললেও চলে।

ওঙ্কাবধামেব বয়স তখন পূবো একবৎসরও হয় নি। ভারত রাহু সম্বুদ্ধি নামে এক রাজা বিদ্রোহী হয়ে হঠাৎ একরাত্রে সসৈন্যে প্রাসাদ আক্রমণ কবলেন।

প্রাসাদেব বাহিবে যে-সব প্রহবী ছিল তারা সকলেই মারা পড়ল। বিদ্রোহীবা সিংহদ্বাব দিয়ে ভিতরে ঢুকতে লাগল পঙ্গপালের মত দলে দলে। ভিতরের প্রহরীবা প্রাণভয়ে কে কোথায় স'রে পড়ল তার কোন সন্ধানই মিলল না!

বিদ্রোহীদের জয়ধ্বনিতে মহারাজ যশোবর্ম্মনের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে প্রাসাদে ঢোকবার সংকীর্ণ এক পথের উপরে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর পাশে রইল দুইজন মাত্র সাহসী যোদ্ধা।

বিদ্রোহীরা দলে খুব ভারী ছিল বটে, কিন্তু একসঙ্গে দুই-তিনজনের বেশী লোকের পক্ষে সেই সংকীর্ণ পথে প্রবেশ করা সম্ভবপর ছিল না।

মহারাজ যশোবর্ম্মণ বিপুলবপু নিয়ে সেই পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে

নিজের প্রাণ ও রাজ্য রক্ষার জন্যে উন্মত্তের মত অসিচালনা করতে লাগলেন—বিদ্রোহীরা এগিয়ে আসছে আর গোড়াকাটা কলাগাছের মত মাটির উপরে লুটিয়ে পড়েছে।

যশোবর্ম্মণের দুই সঙ্গী রাজার জন্যে প্রাণ দিলে, কিন্তু মহারাজের সতর্ক তরবারি এড়িয়ে তবু কেউ ভিতরে ঢুকতে পারলে না।

বিদ্রোহীদের নেতা ভারত রাহু তখন মহাবিক্রমে যশোবর্ম্মণকে আক্রমণ করলেন—দুই বীরের মুক্ত তরবারি বারবার পরস্পরের আলিঙ্গনে ধরা পড়তে লাগল।

যুদ্ধ যখন শেষ হ'ল তখন দেখা গেল, বিদ্রোহী ভারত রাহুর মৃত-দেহের উপরে সগর্ব্বে দাঁড়িয়ে, শূন্যে রক্তাক্ত তরবারিতে বিদ্যুৎ খেলিয়ে মহারাজ যশোবর্ম্মণ সিংহনাদ করছেন! বাকি বিদ্রোহীরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল!"

হাতী সিং ও আর-চারজন অনুচর প্রত্যেকেই এক-একটা পেট্রলের লণ্ঠন নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, এবং সেই প্রচণ্ড আলোকের তীব্রতায় ভয় পেয়ে দূরে স'রে স'রে যাচ্ছে ছায়াময় অন্ধকার।

সে আলোতে কোথাও স্পষ্ট এবং কোথাও অস্পষ্ট ভাবে দেখা গেল, বিরাট সব দানবের প্রস্তরমূর্ত্তি বহুমুণ্ড সর্পদের ধ'রে পাশাপাশি ব'সে আছে! উপবিষ্ট অবস্থাতেই প্রত্যেক দানবের উচ্চতা আট ফিটের কম হবে না। কোন কোন দানব শতাব্দী ধ'রে প্রকাণ্ড শিলাসর্পের গুরুভার আর বইতে না পেরে যেন শ্রান্ত হয়েই নীচের খালের ভিতরে গড়িয়ে প'ড়ে গেছে!

অমলবাবু বললেন, "আগে এমনি পাঁচশো চল্লিশটি দানব এখান-কার পাঁচটি সিংহদ্বারের কাছে পাহারায় নিযুক্ত থাকত। এখানে কোথাও ক্ষুদ্রতা কি অপ্রাচুর্য্য নেই! যা দেখবে সবই বিরাট! ওঙ্কারধামের প্রধান মন্দির-চূড়ার উচ্চতা হচ্ছে দুশো পঞ্চাশ ফুট—অর্থাৎ কলকাতার গড়ের মাঠের মনুমেণ্টের চেয়ে তা দু-গুণ বেশী

উঁচু। আব তার অন্য চারটি শিখরও বড় কম যায় না, কারণ তাদের প্রত্যেকের উচ্চতা হচ্ছে দেড়শো ফুট ক'রে! আর চারিদিক ঘিরে ঐ যে খাল চ'লে গেছে, তাও চওড়ায় দুশো ত্রিশ ফুট!"

সর্পমূর্ত্তি চোখে পড়ে চতুর্দ্দিকেই।

এর দুই কারণ থাকতে পারে। প্রথম, সাপ হচ্ছে শিবের প্রিয় জীব এবং ওঙ্কারধাম হচ্ছে আসলে শিবেরই লীলানিকেতন। দ্বিতীয়, ওঙ্কারধামের প্রথম রাজা কম্বু বিবাহ করেছিলেন নাগরাজের কন্যাকেই। এবং এ স্থানটা হচ্ছে নাগরাজ্যেরই অংশবিশেষ।

যেখানেই ভারত-শিল্পীর বাটালি পড়েছে সেখানেই জন্মলাভ করেছে অসংখ্য হাতীর মূর্ত্তি।

এখানেও তাই। সর্ব্বত্রই এত হাতী যে দেখলে অবাক হ'তে হয় এবং অধিকাংশ মূর্ত্তিই জীবন্ত হাতীর মতই মস্ত বড়! এমন বৃহৎ সব মূর্ত্তি এত অজস্র পরিমাণে গড়তে যে কত যুগের দরকার হয়েছিল তা ভাবলেও অবাক হ'তে হয়!

কিন্তু ভারতের শিল্পী হয়তো পরিশ্রম ও কালের হিসাব রাখতে জানত না—তাদের ধৈর্য্যের পরমায়ু ছিল অক্ষয়!

যেন তারা জন্মজন্মান্তর ধ'রে মূর্ত্তি বা মন্দির গড়তেও নারাজ ছিল না! এবং কঠিন পাথর ছিল তাদের হাতে যেন নরম ভিজে বেলে মাটির মত! তাদের হাতের মায়া-ছোঁয়া পেলে পাথর যেন বেঁকে-নুঁয়ে-দুমড়ে অতি-সহজেই শিল্পীর ইচ্ছামত যে-কোন আকার ধারণ করতে বাধ্য হত! এ-বিষয়ে ভারত-শিল্পের কাছে পৃথিবীর আর সব দেশের শিল্পই ম্লান হ'য়ে যাবে!

দেয়ালের গায়ে গায়ে পাথরের খোদা ছবিই বা কত!

সেই ছবির পর ছবির সারি মাপ্‌লে নিশ্চয়ই একমাইলের কম হ'বে না! কোথাও মত্ত হস্তীরা ধেয়ে চলেছে, কোথাও দেবতা, দানব, মানবের জনতা, কোথাও রামায়ণের দৃশ্যের পর দৃশ্য, কোথাও

গভীর অরণ্যে বন্য জন্তুরা বিচরণ করছে, কোথাও সাগরে সামুদ্রিক জীবরা সাঁতার কাটছে, কোথাও রন্ধনশালায় রান্না হচ্ছে, বাজারে নানা জিনিষের বিকিকিনি চলছে, বাজীকররা হরেক-রকম খেল্ দেখাচ্ছে এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ঘোড়ায় চ'ড়ে পোলোর মতন কি-এক খেলায় নিযুক্ত হ'য়ে আছেন!

রাজা-প্রজা, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, দেবদাসী, রাজকুমারী, সুয়োরাণী-দুয়োরাণী, সখীর দল, বাঁদী ও তীর্থযাত্রী—কিছুরই অভাব নেই! দ্বন্দ্বযুদ্ধ, স্থলযুদ্ধ, জলযুদ্ধ, রাজসভা, কুচ্‌কাওয়াজ শোভাযাত্রা, উৎসব, পূজা, নাচ, ঘর-সংসার,—শিল্পীর বাটালি কোন-কিছুরই প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করেনি!

মহাকালের অদৃশ্য হস্ত কত শতাব্দীর রহস্যময় যবনিকা হঠাৎ এখানে সরিয়ে দিয়েছে, তাই হাজার বছর পরেও এখানে এসে বিংশ শতাব্দী বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দেখছে সেকালের সমস্ত সুখ-দুঃখ-মাখা বিচিত্র জীবনযাত্রার চিত্র।

প্রথম দর্শনে সন্দেহ হয়, এই মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বেও এরা সবাই জীবন্ত গতির লীলায় চঞ্চল হ'য়ে অতীত নাট্যলীলার পুনরভিনয় করছিল, বর্ত্তমানের ক্ষুদ্র মানুষদের পদশব্দ পেয়ে এখন স্তম্ভিত হ'য়ে গেছে আচম্বিতে!

আসলে কিন্তু সমস্তই অতীত!

যোদ্ধাদের ধনুকগুলো নুয়ে আছে, কিন্তু তীর আর ছুটবে না! মায়ের কোলে শুয়ে পাথুরে শিশুরা স্তন্যপান করছে, কিন্তু তারা আর বালক বা যুবক হ'তে পারবে না! শিলাহস্তীর দল তাদের যে-সব পা শূন্যে তুলেছে, সেগুলো আর কখনো মাটিতে পড়বে না! সৈন্যদল যুদ্ধযাত্রায় বেরিয়েছে যাদের বিরুদ্ধে, সেই বিদেশী শত্রুদের সঙ্গে তাদের আর-কোনদিন দেখা হবে না, রাজসভার মধ্যে সিংহাসনের উপরে ছত্রের তলায় মহারাজ ব'সেছেন বিচারে, কিন্তু তাঁর মুখ আর কথা কইবে না! এরা এখন সবাই আড়ষ্ট,

সবাই চির-বোবা!

আরো কত যুগ আসবে, আবার চ'লে যাবে, কিন্তু সেই মৃত জাতির লুপ্ত সভ্যতার এই কালজয়ী স্মৃতি তখনো এমনি স্তম্ভিত ও আড়ষ্ট হ'য়েই এখানে বিরাজ করবে।

সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে ব'লে উঠলেন, "হুম্! এ যে পাথরের সিনেমা! কত গল্পের ছবিই এখানে রয়েছে!"

অমলবাবু বললেন,—"সত্যিই তাই! সেকালের অধিকাংশ লোকই তো পড়তে জান্‌ত না, প্রাচীন শিল্পীরা তাই মন্দিরের গায়ে সমস্ত বিখ্যাত কাব্যের আর ইতিহাসেব ছবি খুদে রাখতেন। নিরক্ষর লোকরাও সেগুলো দেখে শিক্ষালাভ করত।"

মাণিকও এই শিলাময় নূতন জগতে এসে বিস্মিত হ'য়েছিল, কারণ ভারত-শিল্পীর এই নূতন স্বদেশে এসে বিস্মিত না হয়ে থাকতে পারে কে? কিন্তু সে-বিস্ময় তাকে বেশীক্ষণ অভিভূত ক'রে রাখতে পারে নি। তার মাথায় ঘুবছে কেবল জয়ন্তের কথা এবং তার মন ক্রমাগত হা-হা কবে উঠছে!

অমলবাবুর কোন উক্তিই ভালো ক'রে তার কাণে ঢুকছিল না, শূন্যদৃষ্টিতে চারিদিকেব শিল্পকাজের দিকে তাকাতে তাকতে সে হন্-হন্ ক'রে এগিয়ে চল্‌ল,—লণ্ঠনেব আলোক-রেখাগুলো যে তার পিছনে অনেক দূরে প'ড়ে রইল, সে-খেয়ালও তার রইল না!

এক-জায়গায় মোড় ফিরে সে যেখানে এসে দাঁড়াল সেখানে কেবল চাঁদেব আধ-ফোটা আলোতে চাবিদিক থম্‌থম্ কর্‌ছে।

অস্পষ্টভাবে দেখা গেল মস্ত মস্ত পাথরের হাতীর পর হাতী সার গেঁথে কোথায় কতদূরে নিবিড় তিমিরের ভিতরে হারিয়ে গিয়েছে, তার কোন ঠিক-ঠিকানাই নেই!

হঠাৎ তার হুঁস্ হ'ল, এব পরে কোন্ দিকে যেতে হ'বে তা সে-জানে না এবং ভুল পথে গেলে সঙ্গীদের সঙ্গে হয়তো আর দেখা হবে না। মাণিক সেইখানেই দাঁড়িয়ে প'ড়ে সঙ্গীদের জন্যে অপেক্ষা

করতে লাগল।

তারা-ছড়ানো আকাশ তখন যেন তন্দ্রাময়। খানিক তফাতে অরণ্যের কালিমাময় বুকের তলা থেকে ভেসে আসছে যেন রাত্রি-দানবীর ফিস্-ফিস্ কাণাকাণি! জীবন্ত জগতের আর কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

চতুর্দ্দিকের নিস্তব্ধতা আচম্বিতে, আর যেন চুপ ক'রে থাকতে না পেরে, পাগল হয়ে গর্জ্জন ক'রে উঠল—গুড়ুম্, গুড়ুম্, গুড়ুম্!

চম্‌কে উঠে মাণিক ফিরে দাঁড়াল বিদ্যুতের মত!

পিছনে অনেক লোকের গোলমাল!

আবার দু-বার বন্দুকের শব্দ, তারপরেই দূর থেকে সুন্দরবাবুর চীৎকার শোনা গেল—"মাণিক! মাণিক!"

মাণিক ফিরে দৌড়োবার উপক্রম করছে, হঠাৎ একটা গুরুভার তার পিঠের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং কোন-কিছু বোঝবার আগেই বিষম এক ধাক্কায় সে একেবারে মাটির উপরে উপুড় হয়ে মুখ থুব্‌ড়ে প'ড়ে গেল!

তারপরেই কে তার পিঠের উপরে চেপে বসল এবং দুখানা বড় বড় চ্যাটালো হাতে প্রাণপণে তার গলা চেপে ধরল!

সেই অজ্ঞাত শত্রুকে পিঠ থেকে ঠেলে ফেলে দেবার জন্যে মাণিক তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলে, কিন্তু কিছুই করতে পারলে না! দশটা লোহার মতন কঠিন আঙুলের চাপে তার সমস্ত জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেল।

যুদ্ধের
আয়োজন

কতক্ষণ পরে তার জ্ঞান ফিরে এল মাণিক তা জানেনা, কিন্তু চোখ মেলে দেখলে সুন্দরবাবু ও অমলবাবু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখে তার দেহের দুইপাশে ব'সে আছেন এবং হাতী সিং ব'সে আছে তার মাথাটা নিজের কোলের উপরে টেনে নিয়ে।

প্রথমটা কিছুই মনে পড়ল না।

কিন্তু সে উঠে বসবার চেষ্টা করতেই অমলবাবু ব'লে উঠলেন, "না, না, আপনি আরো খানিকক্ষন শুয়ে থাকুন!"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্, বিপদে পড়লুম আমরা, লড়াই করলুম আমরা, শত্রুদের তাড়ালুম আমরা। কিন্তু তুমি খামোকা অজ্ঞান হয়ে গেলে কেন বাপু?"

তখন মাণিকের সব স্মরণ হ'ল এবং তার কণ্ঠদেশ যে বেদনায় টন্‌টন্ করছে এটাও অনুভব করতে পারলে।

সে বললে, "সুন্দরবাবু, পিছন থেকে হঠাৎ আক্রমণ ক'রে কে যেন আমার গলা টিপে ধ'রেছিল! আপনারা কি এখানে এসে কারুকে দেখতে পাননি?"

—"হুম্, তুমি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলে। স্বপ্ন দেখে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে। এখানে এসে আমরা টিকটিকির ল্যাজ্ পর্য্যন্ত দেখতে পাই নি। পেয়েছি কি অমলবাবু?"

—"না।"

মাণিক বললে, "আমার গলায় ভয়ানক ব্যথা! সুন্দরবাবু, এটাও কি স্বপ্নদেখার ফল?"

—"কৈ দেখি! তাই তো হে মাণিক, তোমার গলার ওপরে যে অনেকগুলো আঙুলের লাল লাল দাগ রয়েছে! কে তোমার গলা টিপে ধ'রেছিল? কেন ধ'রেছিল? সে ব্যাটা গেল কোথায়?"

অমলবাবু বললেন, "ব্যাপার তো কিছুই বুঝতে পারছি না! তোমাকে আক্রমণ করাবও মানে হয় না, আমাদেরও আক্রমণ করার মানে হয় না।"

—"আপনাদের কে আক্রমণ কবেছিল?"

—"অনেকগুলো লোক। আক্রমণ ক'রেছিল বললে ঠিক হয় না, কারণ তারা আমাদের কাছে আসে নি। তুমি তো এগিয়ে এলে, আমি সুন্দরবাবুর সঙ্গে কথা কইতে কইতে আসছিলুম! হঠাৎ দূরে বনের ভিতর থেকে চার পাঁচজন লোক বেরিয়ে আমাদের দিকে ছুটে আসতে লাগল। আমরা বন্দুক ছুঁড়তেই তারা আবার অদৃশ্য হ'ল! মিনিটখানেক পরে পথেব আর একদিকে আবার চার পাঁচজন লোকের আবির্ভাব, আবার আমাদের বন্দুক ছোঁড়া—আবার তাদের অন্তর্ধান!"

সুন্দরবাবু বললেন, "আমার মনে হ'ল, তারা আমাদের আক্রমণ করতে চায় না, কেবল আমাদের ভয় দেখাতে চায়!"

মাণিক ধড়্‌মড়িয়ে উঠে ব'সে তাড়াতাড়ি জামার বোতাম খুলে ভিতর দিকে হাত চালিয়ে দিয়ে কি যেন অনুভব করলে, তারপর আশ্বস্ত ভাবে বললে, "নাঃ, ঠিক আছে!"

সুন্দরবাবু বিস্মিত কণ্ঠে সুধোলেন, "কি ঠিক আছে, মাণিক?"

"সেই চাবিটা। আমার জামার ভিতর-দিককার পকেটে সেই চাবিটা রেখে পকেটের মুখটা সেলাই করে দিয়েছি। শত্রুরা কোনগতিকে সন্দেহ করেছে চাবিটা আমার কাছেই আছে। এটা হাতাবার জন্যেই তারা আমাকে একলা পেয়ে মারবার, আর আপনাদের ভয় দেখাবার চেষ্টা ক'রেছিল।"

অমলবাবু বললেন, "তার মানে?"

—"মানে খুব সহজ। আমি বোকার মত এগিয়ে আপনাদের চোখের আড়ালে এসে প'ড়েছিলুম। তখন একজন কি দুজন শত্রু অতর্কিতে আমাকে আক্রমণ করতে আসে। সেই সময়টায় আপনাদের অন্যমনস্ক রাখবার জন্যে বাকি শত্রুরা আপনাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা খেলছিল!"

সুন্দরবাবু বললেন, "মাণিক, তোমার কথাই ঠিক ব'লে মনে হচ্ছে! কিন্তু তোমাকে গলা টিপে অজ্ঞান ক'রে ফেলেও তারা ঐ চাবিটা নিয়ে গেল না কেন?"

—"এর একমাত্র কারণ হ'তে পারে, হয়তো চাবিটা খুঁজতে তাদের দেরি হয়েছিল। আপনারা এসে পড়াতে তারা পালিয়ে যায়।"

—"খুব সম্ভব তাই।"

এমন সময়ে হাতী সিং জমির উপর থেকে কি একটা ছোট চক্‌চকে জিনিষ তুলে নিয়ে মাণিককে বললে, "বাবুজী, আপনি উঠে বসতেই এটা আপনার বুক থেকে মাটির ওপরে প'ড়ে গেল!"

সেই জিনিষটার দিকে তাকিয়েই সকলের দৃষ্টি যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতন হয়ে গেল। সেটা আর কিছু নয়, সেই নক্সা-আঁকা সোনার চাক্তি!

কি অদ্ভুত রহস্য।

চাক্তি ছিল আগে হতভাগ্য জয়ন্তের কাছে, তারপর তাকে হত্যা ক'রে শত্রুরা নিশ্চয়ই এই চাক্তিখানাকে হস্তগত করেছিল, কিন্তু যে অমূল্যনিধির জন্যে এতে খোঁজাখুঁজি, এত হানাহানি, এমন অরক্ষিত অবস্থায় সেই জিনিষটাই মাণিকের বুকের উপরে অযাচিত ভাবে এসে পড়ল কেমন ক'রে?

তাড়াতাড়ি চাক্তিখানা নিয়ে লণ্ঠনের আলোতে ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে মাণিক হতবুদ্ধির মত বললে, "এ যে সেই চাক্তি,

তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই! কিন্তু—কিন্তু, নাঃ, আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে!"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্, আমিও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাচ্ছি!"

খানিকক্ষণ সকলেই বিস্ময়ে স্তব্ধ! তারপর অমলবাবু ধীরে ধীরে বললেন, "হয়তো মাণিককে যে আক্রমণ করেছিল, ধস্তাধস্তির সময়ে চাক্তিখানা তার অজান্তেই প'ড়ে গিয়েছে!"

মাণিক বললে, "আপাতত তাই মনে করা ছাড়া উপায় নেই! কিন্তু এ বড় আশ্চর্য্য?"

আচম্বিতে সুন্দরবাবু কি দেখে চম্‌কে উঠলেন!

তাড়াতাড়ি একটা লণ্ঠন তুলে ধ'রে জমির দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বিপুল বিস্ময়ে ব'লে উঠলেন, "হুম্! এ আবার কি?"

মাণিক অবাক হয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলে, তার পাশের জমির উপরে অনেকখানি রক্ত প'ড়ে রয়েছে,—খালি রক্ত নয়, সেই সঙ্গে রয়েছে একখানা বড় ছোরা বা ছোট তরবারির মত অস্ত্র এবং মানুষের হাতের সদ্য-কাটা আঙুল!

অমলবাবু এ-রকম ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন না, তিনি শিউরে উঠে দুহাতে মুখ ঢেকে ফেললেন!

সুন্দরবাবু মাণিকের দুই হাতের উপরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, "মাণিক, তোমার হাতের একটা আঙুলও তো হারিয়ে যায় নি দেখছি! তবে এ বেওয়ারিস আঙুলের অর্থ কি?"

মাণিক তীক্ষ্নদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ ধ'রে আঙুলটা দেখে বললে, "আঙুলটা কি-রকম লম্বা আর মোটা দেখছেন তো! এ আঙুল যারই হোক্, তাকে খুব ঢ্যাঙা আর বলিষ্ঠ ব'লেই মনে হয়!"

অমলবাবু সচকিত কণ্ঠে বললেন, "শত্রুদের দলে চ্যান্ আছে কি না জানি না, কিন্তু খুব ঢ্যাঙা আর বলিষ্ঠ লোক বললে চ্যান্‌কেই আমার মনে পড়ে!"

সুন্দরবাবু বললেন, "ধ'রে নেওয়া যাক্, চ্যান্ সকলের চোখে

ধূলো দিয়ে কোন রকমে এক জাহাজেই আমাদের সঙ্গে এসেছে! ধ'রে নেওয়া যাক্, চ্যান্‌ই গলা টিপে মাণিককে অকালে স্বর্গে পাঠাবার চেষ্টা করেছিল! কিন্তু চ্যানের আঙুল বলি দিলে কে? মাণিক, অজ্ঞান হবার আগে তুমি লড়াই ক'রেছিলে?"

মাণিক বললে, "লড়াই করব কি, কে আমাকে আক্রমণ করেছিল তাও দেখতে পাই নি! আর দেখছেন না, ছোরাখানাও রক্তমাখা! নিশ্চয়ই ঐ ছোরাতেই আঙুলটার উচ্ছেদ হয়েছে! ও-রকম দু-ধারে ধার দেওয়া ছোরা কখনো আমার কাছে ছিল না! ও ছোরা কার? ওর মালিক ওখানা ফেলে রেখে গিয়েছে কেন? আমাকে বাঁচাবার জন্যেই সে যদি আমার শত্রুকে ছোরা নিয়ে আক্রমণ ক'রে থাকে, তবে সেও পালিয়ে গেল কেন? তাকে তো আমরা বন্ধু ব'লে পরম সমাদর করতুম! আর এই অজানা মুল্লুকে বন্ধুই বা পাব কোত্থেকে, বন্ধু তো আকাশ থেকে খ'সে পড়ে না!"

অমলবাবু বললেন, "এক হ'তে পারে, পদ্মরাগ বুদ্ধের লোভে ঐ সোনর চাক্তিখানার জন্যে শত্রুরা নিজের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি ক'রেছিল!"

সুন্দরবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, "ও সব বাজে কথা! শত্রুরা নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি করতে পারে, কিন্তু মাণিককে বাঁচাবার জন্যে তাদের কারুরই মাথাব্যথা হ'তে পারে না! হুম্, এ-সব হচ্ছে ডাহা ভুতুড়ে কাণ্ড। এ-জায়গাটা হচ্ছে হাজার বছরের পুরোণো একটা মরা জাতের গোরস্থানের মত! এখানকার আনাচে কানাচে ভূতের আড্ডা আছে!"

মাণিক বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে, "এ যদি ভুতুড়ে কাণ্ড হয় আমি ত'হলে বলব, জয়ন্তের প্রেতাত্মাই আমাকে আজ বাঁচিয়েছে, আর নিজের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েছে!"

সুন্দরবাবু তখনি টপ্ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আর এখানে

থাকা উচিত নয়। আমি অবশ্য জয়ন্তকে অত্যন্ত ভালবাসি কিন্তু তার প্রেতাত্মাকে ভালোবাসবার ইচ্ছে আমার নেই। আমার বাবা-মা স্বর্গে গিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের প্রেতাত্মা এলেও আমি আর দেখা করব না! ওঠ মাণিক, উঠুন অমলবাবু!"

মাণিক গাত্রোত্থান ক'রে বললে, "হ্যাঁ, এখানে আর দেরি ক'রে লাভ নেই। এই গভীর রহস্যের কিনারা না ক'রেই আমাদের তাড়াতাড়ি যাত্রা কবতে হবে।"

সুন্দরবাবু বললেন, "খালি ভূত নয়, এখানে চারিদিকে শত্রুরাও লুকিয়ে আছে। তারা আমাদের সমস্ত গতিবিধিই লক্ষ্য করছে! তারা যে সাহস ক'রে আমাদের আক্রমণ করতে পারছে না, তার কারণ হচ্ছে আমরা সবাই সতর্ক আর আমাদের হাতে আছে চার চারটে বন্দুক। ··আরে গেল, এই হাতী সিং! তোমার নাম গাধা সিং হওয়া উচিত! তোমার বন্দুকের মুখনল আমার ভুঁড়ির দিকে নামিয়ে রেখেছ কেন? যদি ফস্ ক'রে আওয়াজ হয়ে যায়? অমন ক'রে বন্দুক ধরতে নেই, ওটা কাঁধে তোলো!"

আলোয়-ছায়ায়, মাঠে-জঙ্গলে, পথে-বিপথে আবার সবাই এগিয়ে চলল।

রাত পোয়ালো, ঊষার সিঁথায় দিবস-বধূ সিঁদূর-লেখা লিখলে, মাঠ-বাটের উপর দিয়ে তপ্ত দুপুরে-হাওয়া তেষ্টায় হা-হা ক'রে গহনবনের ঠাণ্ডা বুকের ভিতরে গিয়ে নিসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ল, সন্ধ্যার মেঘ-মন্দিরে সূর্য্যচিতার রক্ত-শিক্ষা জ্ব'লে উঠল, রাত্রি আবার তার অন্ধ-কুঠুরীর দরজা খুলে ছায়া-অনুচরদের পৃথিবী-ভ্রমণে পাঠিয়ে দিলে!

মাঝে মাঝে দেখা দেয় মাটির উপরে চির-চলন্ত বৃহৎ জলসর্পের মত নদী। তখন ওঠে নদী পার হবার সমস্যা!

মাঝে মাঝে বিপুল অরণ্য বাহুবিস্তার ক'রে পথ রুদ্ধ ক'রে

দাঁড়ায়। তখন কুঠার নিয়ে বনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। মাঝে মাঝে গিবন-বানরের দল গাছের নীচের ডাল থেকে মগ্-ডালে লাফ মেরে কিচিরমিচির ভাষায় কি ব'লে ওঠে এবং কৌতূহলী চোখে নীচের দিকে তাকিয়ে এই নির্জ্জন বনরাজ্যে প্রথম মানুষদের দেখে, আর বোধ করি আশ্চর্য্য হয়ে ভাবে—'এরা আবার কোন্ দেশী বানর? এদের ল্যাজ নেই, গায়ে লোম নেই, এরা গায়ে জড়িয়ে রাখে কি কতকগুলো সাদা সাদা জিনিষ, দু-পা দিয়ে হাঁটে, এরা আবার কোন্‌দেশী বানব?'

মাঝে মাঝে বাঁশবন তুলে-তুলে ওঠে, মড়-মড় ক'রে শব্দ হয়, বোঝা যায় হাতীব দল ওখানে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করছে! মাঝে মাঝে ধারাবাহিক ঝোপ-ঝাপের উপর দিয়ে তীব্র একটা গতির রেখা সশব্দে চ'লে যায়—একটা চাপা গর্জ্জনও শোনা যায়, বনের মধ্যে অশান্তিকর অনাহুত অতিথি দেখে বাঘ বা অন্য হিংস্র জন্তু দূরে স'রে গেল!

মাঝে মাঝে মানুষের ঘৃণ্য পায়েব শব্দে লম্বা ঘাসের ভিতরে গোখ্‌রো-সাপেব ঘুম ভেঙে যায়, ফোঁশ্ ক'রে ফণা তোলে, তীক্ষ্ণ চক্ষে জ্বলন্ত হিংসার স্ফুলিঙ্গ ঠিক্‌রে পড়ে এবং পর মুহূর্ত্তেই বিদ্যুতের মত অদৃশ্য হয়।...এবং সর্ব্বক্ষণ সারা বনে জেগে থাকে যাদের দেখা যায় না, বোঝা যায় না, তাদের অশ্রান্ত অস্তিত্বের ধ্বনি!

কে যেন নিরালায় কাণাকাণি করছে; কে যেন আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখে ফিস্-ফিস্ ক'রে কথা বলছে; কে যেন শুক্‌নো পাতা মাড়িয়ে অতি-সন্তর্পণে পিছনে পিছনে আসছে আবার থেমে পড়ছে, আসছে আবার থেমে পড়ছে।

গভীর দূর-বিস্তৃত নানাশব্দময় প্রত্যেক অরণ্যই মানুষের পক্ষে ভয়াবহ!

কোন অরণ্যই আধুনিক নগরবাসী মানুষকে সাদর সম্ভাষণ জানায় না। বনবাসী কোন জীবই মানুষকে বন্ধু ব'লে মনে করে

না। কল্পনায় নির্জ্জনতাকে মিষ্টি লাগে, কিন্তু অরণ্যের এই সশব্দ নির্জ্জনতা মনকে দেয় দমিয়ে।

পদে পদে বিপদের সম্ভাবনায় মানুষ চম্‌কে ওঠে! বোধ হয়, প্রত্যেক শব্দই আসছে লুকানো মৃত্যুর কণ্ঠ থেকে!

সমস্ত অরণ্যকেই বিরাট একটা প্রেতাত্মা ব'লে সন্দেহ হয়। সূর্য্যালোক তাকে কতকটা বন্ধুর ছদ্মবেশ পরাতে চেষ্টা করে বটে, কিন্তু রাত্রির ঘোর অন্ধকারে মানুষের মন সেখানে ভয়ে কুঁকড়ে পড়ে এবং অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে ?—অরণ্যের মত ভয়ঙ্কর তখন আর কিছুই নেই! কারণ কেবল কাণে তখন সন্দেহজনক শব্দ শোনা যায় না, চোখও তখন সভয়ে দেখে কাছে, দূরে, শত শত বিভীষিকাময় আনাগোনা! বিজন অরণ্যে চন্দ্রালোকের চেয়ে অন্ধকার সহনীয়!

আর-একটা দুঃস্বপ্নময় রাত্রির পরে এল স্নিগ্ধ শান্তপ্রভাত।

অমলবাবু বললেন, "আমরা খুব তাড়াতাড়ি চলছি। আজ সন্ধ্যার আগেই ভাঙা মন্দিরেরে কাছে পৌঁছতে পারব।"

সুন্দরবাবু বললেন, "কিন্তু শত্রুদের আর কোন সাড়াশব্দ নেই।"

মাণিক বললে, "কিন্তু তারা যে আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছে, এটা সর্ব্বদাই মনে রাখবেন। আমরা সশস্ত্র আর সাবধান বলেই তারা এখনো সামনে আসছে না।...কাল রাত্রেই আমি তাঁবুর বাইরে পায়ের শব্দ শুনেছি। কে যেন পায়চারি ক'রে বেড়াচ্ছিল। বাইরে বেরিয়ে তাকে ধরতে পারলুম না বটে, কিন্তু বেশ দেখলুম, একটা ছায়া ছুটে জঙ্গলের ভিতরে মিলিয়ে গেল!"

সুন্দরবাবু বললেন, "কি আশ্চর্য্য, তুমি আমাদের ডাকলে না কেন? এক বেটার আঙুল কাটা গেছে, এ বেটাকে ধরতে পারলে আমি এর নাকটা কচ্‌ ক'রে কেটে নিতুম!"

মাণিক বললে, "তার নাক নিয়ে আপনি কি করতেন, সুন্দরবাবু? যদিও আপনার নাকটি খ্যাঁদা, তবু তার নাক টিকলো হ'লেও

আপনার অভাব তো দূর হত না ?”

সুন্দরবাবু ক্ষাপ্পা হয়ে বললেন, “এরকম ঠাট্টা আমি পছন্দ করিনা ! আমার নাক খ্যাঁদা ? কে বললে তোমাকে ? আমার নাক খ্যাঁদা নয় !”

সকলে জঙ্গল থেকে বেবিয়ে একটা মাইল-খানেক চওড়া মাঠের উপর এসে পড়ল !

কেবল মাঠে নয়, মাঠের একপাশ দিয়ে ঝির্-ঝির্ ক'রে বয়ে যাচ্ছে একটি ছোট্ট নদী এবং তার তীবে তীরে চ'রে বেড়াচ্ছে একঝাঁক পাখী !

সুন্দরবাবু খুসি-গলায় ব'লে উঠলেন, “বন-মুর্গী ! এস মাণিক, দেখা যাক ভগবান আজ আমাদেব বন-মুর্গীর মাংস খাওয়াতে পাবেন কিনা !”

মাণিক মাথা নেড়ে বললে, “না সুন্দরবাবু ! জয়ন্ত মুর্গীর মাংস খেতে ভালোবাসত ! সে যখন নেই, আমাব মুখে ও-মাংস আজ আর রুচ্‌বে না !”

এদিকে মানুষের সাড়া পেয়ে মুর্গীগুলো তখনি উড়ে পালালো ! সুন্দববাবু হতাশ ভাবে সেই উড়ন্ত, জ্যান্তো খাবাবগুলোর দিকে তাকিয়ে ফোঁশ্ ক'বে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন।

মাণিক বললে, “দেখুন সুন্দরবাবু, আমাব মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে !”

—“হুম্ ! সুবুদ্ধি, না কুবুদ্ধি ?”

—“আমাদের পক্ষে সুবুদ্ধি। ইচ্ছা করলে এখনি আমরা দেখতে পারি, শত্রুরা আমাদেব পিছু পিছু আসছে কিনা ? সঙ্গে সঙ্গে তাদের কিঞ্চিৎ শিক্ষাও দিতে পারি !”

—“কি ক'বে শুনি ?”

—“এই মাঠটা দেখছেন তো ? এর মধ্যে গাছপালা কিছুই নেই। এপারে গভীর বন, ওপারেও গভীর বন ! আমরা এখনি

ওপারের বনে গিয়ে ঢুকব। তারপর না এগিয়ে ঝোপের আড়ালে বন্দুক বাগিয়ে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থাকব।"

সুন্দরবাবু বললেন, "খাসা মৎলোব এঁটেছো ভায়া! শত্রুরা যদি আমাদের পিছনে লেগে থাকে, তাহ'লে তাদেরও এই মাঠ পার হ'তে হবে। এখানে লুকোবার যায়গা নেই, তারা এলেই আমরা দেখতে পাব! তারপরেই আমাদের বন্দুকগুলো গুড়ুম গুড়ুম রবে গর্জ্জন ক'রে উঠবে,—কেমন, তাই নয় কি?"

—"ঠিক তাই। কিন্তু আমরা তাদের পা লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুঁড়ব। নইলে নরহত্যার দায়ে পড়তে হবে!"

—"ও সব শত্রুকে হত্যা করলেও পাপ নেই। ওরা তো আমাদের খুন করতেই চায়, আমরাও আত্মরক্ষা করব না কেন? চল, এখন তোমার কথা-মতই কাজ করা যাক!"

সকলে ওপারের বন লক্ষ্য ক'রে দ্রুতপদে অগ্রসর হ'ল। মাঠ শেষ হয়ে গেল।

মাণিক বললে, "এখানে বেশীর ভাগই বাঁশবন। গোটাকয়েক বটগাছও আছে। এদিকে বেতবন, নীচে সব জায়গা জুড়ে রয়েছে আগাছার জঙ্গল। এর মধ্যে লুকিয়ে থাকলে কেউ আমাদের দেখতে পাবে না। আসুন, গা-ঢাকা দেওয়া যাক! একটু পরেই হয়তো চ্যান্ আর ইনের খবর পাওয়া যাবে!"

সকলে একে একে ঝোপের ভিতর অদৃশ্য হ'ল।

সবুজে মাঠ ধূ-ধূ করছে।

ওদিককার বন-রেখার উপর থেকে এই অভিনব নাট্যলীলার দর্শক-রূপে সূর্য্যদেব রাঙামুখে তাকিয়ে রইলেন, তাঁর সোনা-হাসি ওপাশের নদীর লহরে লহরে নেচে নেচে খেলতে লাগল।

গানের পাখীরাও নীরব হয়ে ছিল না।

হানা দেবালয়ের

জীবন্ত পাথর

মাণিকের অনুমানও ব্যর্থ হয় নি, তার ফন্দিও ব্যর্থ হ'ল না!

মিনিট পাঁচেক পরেই দেখা গেল, ওধারের বনের ভিতর থেকে কারা যেন বেরিয়ে আসছে। দূর হ'তে তাদের দেখাচ্ছে খুব ছোট ছোট!

সুন্দরবাবু দূরবীণটা তাড়াতাড়ি চোখে লাগিয়ে সোৎসাহে বললেন, "এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ! হুম্, ব্যাটাদের দলে দশজন লোক আছে। ওরা হন্-হন্ ক'রে এই দিকেই আসছে। হুঁ-হুঁ বাবা, ঘুঘুই দেখেছ ফাঁদ তো দেখনি! চ'লে আয়—চ'লে আয়, চৈ চৈ চৈ! ওরে বাপ্রে। কী লম্বা! কী জোয়ান! যেন ঘটোৎকচের বাচ্ছা! ওর পাশে পাশে আসছে এক বেটা গুড়্গুড়ে্ বেঁটেরাম সর্দ্দার, পায়ে হেঁটে চলেছে, না ফুটবলের মত মাটির উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে?"

—"কই, দেখি দেখি" ব'লে সাগ্রহে অমলবাবু দূরবীণটা সুন্দরবাবুর হাত থেকে প্রায় একরকম কেড়েই নিলেন এবং নিজের চোখে লাগিয়েই ব'লে উঠলেন, "ঐ তো চ্যান! ঐ তো ইন! সাত ঘাটের জল ঘেঁটে এতদিন পরে স্বচক্ষে আবার প্রভুদের দেখা পেলুম! ওরে ও পাপিষ্ঠ, ওরে ও পিশাচ! সুরেনবাবু আর জয়ন্তবাবু তোদের হাতেই প্রাণ দিয়েছেন! তোরা গোপীনাথকে খুন করেছিস্, আমাকেও বধ করতে এসেছিলি! অ্যাঃ! চ্যানের বাঁ-হাতে যে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা! তাহ'লে পশু রাতে মাণিকবাবুকেও ওরা মারতে এসেছিল! হাতী সিং, বন্দুক ছোঁড়ো! বন্দুক ছোঁড়ো!

হতভাগাদের পাগ্‌লা কুকুরের মত মেবে ফেল !"

প্রভুর হুকুম পালন করবার জন্যে হাতী সিং তখনি বন্দুক তুললে, কিন্তু মাণিক তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললে, "বন্দুক নামাও হাতী সিং, আমি যখন বলব তখন ছুঁড়বে! অমলবাবু, আপনি বড়ই উত্তেজিত হয়েছেন, শান্ত হোন্! ওদের আরো কাছে আসতে দিন!"

অমলবাবু চেঁচিয়ে বললেন, "উত্তেজিত হব না—বলেন কি? যমদূতদের দেখলে কি শান্ত হয়ে থাকা যায়?"

সুন্দরবাবু প্রমাদ গুণে বললেন, "অমলবাবুই সব পণ্ড করবেন দেখছি। অত চ্যাঁচালে ওরা কি আর কাছে আসবে?"

তখন অমলবাবু লজ্জিত হয়ে বললেন, "মাপ করুন, আর আমি কথা কইব না!"

ততক্ষণে মাঠের লোকগুলো অনেকটা এগিয়ে এসেছে, তাদের চেহারাও মোটামুটি দেখা যাচ্ছিল।

তারা সবাই হয় বর্ম্মী, নয় শ্যামদেশের লোক এবং তাদের ভিতরে সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে চ্যানের অসম্ভব দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ দেহ! এবং তাকে দেখেই বেশ বোঝা যায় যে, কাটা-আঙুলের যন্ত্রণায় তার অবস্থা বিলক্ষণ কাহিল!

মাণিক বললে, "আসুন, এইবারে বন্দুক নিয়ে আমরা প্রস্তুত হয়ে থাকি। পায়েব দিকে গুলি ক'রে ওদের অকর্ম্মণ্য করতে পারলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'বে, নরহত্যায় দরকার নেই—কি বলেন সুন্দরবাবু?"

—"বেশ, তাই সই।"

এইবারে শত্রুরা বন্দুকের নাগালের ভিতরে এসে পড়ল।

সুন্দরবাবু বললেন, "ওরা যে কেন এতক্ষণ দল বেঁধে আমাদের আক্রমণ করে নি, এইবারে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে! ওদের কাছে আছে মোটে একটা বন্দুক!"

মাণিক বললে, "এইবারে আমাদের চারটে বন্দুক গর্জ্জন করতে

পারে,—ওদের আর এগুতে দেওয়া উচিত নয়!"

সুন্দরবাবু বললেন, "ওয়ান, টু, থ্রি!"

একসঙ্গে চারটে বন্দুক অগ্নি-উদ্গার করলে,—সঙ্গে সঙ্গে মাঠের উপরে সর্ব্বপ্রথমে ধরাশায়ী হ'ল ইনের বাঁটকুল দেহ! বাকি সকলে মহা ভয়ে আর্ত্তনাদ ক'রে যে দিক থেকে আসছিল আবার সেইদিকে দৌড়তে আরম্ভ করলে!

এদিক থেকে দ্বিতীয় বার গুলিবৃষ্টি করা হ'ল।

এবারে লোকগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে পাগলের মত মাঠের নানাদিকে ছুটতে লাগল, আর একজন আহত হয়ে মাটির উপরে আছাড় খেয়েও আবার কোনরকমে উঠে ভো-দৌড় মারলে!

কিন্তু দৌড়তে পারছিল না কেবল ইন্, সে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে আর ভয়ে চ্যাচাতে চ্যাঁচাতে কোনরকমে একটু একটু ক'রে এগিয়ে যাচ্ছিল!

তার দুর্দ্দশা দেখে চ্যান্ আবার ফিরে এল এবং একহাতে ইনের দেহকে সে ঠিক শিশুর দেহের মতই নিজের কাঁধের উপরে তুলে নিয়ে আবার দৌড়তে আরম্ভ করলে!

অমলবাবু চ্যান্‌কে টিপ্ করে বন্দুক ছুঁড়লেন, কিন্তু গুলি তার গায়ে লাগল না।

আরো দু'একবার গুলিবৃষ্টির পর মাণিক বললে, "যথেষ্ট হয়েছে, টোটা নষ্ট ক'রে লাভ নেই! ওরা নানাদিকে দৌড় মেরেছে, আবার বন-বাদাড় ভেঙে একসঙ্গে মিলতে ওদের অনেকক্ষণ লাগবে। তার পরেও আজ আর ওরা আমাদের পিছু নিতে সাহস করবে ব'লে মনে হয় না।"

সুন্দরবাবু মাণিকের পিঠ চাপড়ে বললেন, "হ্যাঁ, ব্যাটারা যত-বড় গুলিখোরই হোক্, আবার গুলি খাবার জন্যে ওরা শীঘ্র ব্যস্ত হবে ব'লে মনে হচ্ছে না—জয় মাণিকের বুদ্ধির জয়!"

পথ চলতে চলতে মাণিক জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা অমলবাবু,

এই পদ্মরাগ-বুদ্ধের কোন ইতিহাস জানেন ?"

অমলবাবু বললেন, "ঠিক পদ্মরাগ-বুদ্ধের ইতিহাস জানিনা বটে, তবে ওঙ্কারধামের ইতিহাসে এরই মত এক মরকত বুদ্ধের-কথা শোনা যায়। ওঙ্কারধাম সাম্রাজ্যের রাজধানী যশোধরপুরে এই মরকত-বুদ্ধের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। *

মরকত-বুদ্ধ নিয়ে তর্ক চলছে।

কেউ বলেন, এখন এই মূর্ত্তি জাপানে আছে। কেউ বলেন, ফর্মোজা দ্বীপে আছে ; কেউ বলেন, জাভায় আছে।

ওঙ্কারধামের পতন হয়, শ্যামদেশের দ্বারা। ওদেশের লোক বলে, তাদের রাজধানী ব্যাঙ্কক্ সহরের মন্দিরে যে সবুজাভ পাথরে গড়া বুদ্ধমূর্ত্তি আছে, সেইটিই হচ্ছে প্রবাদপ্রসিদ্ধ মরকত-বুদ্ধ।

কেবল মরকত বুদ্ধ নয়, ওঙ্কারধামে নাকি একটি স্বর্ণময় বিরাট শিবলিঙ্গ ছিল।

ওঙ্কারধামের বাসিন্দারা থেইস নামে একটি জাতিকে অত্যন্ত ঘৃণা করত। এই থেইস্‌রা বাস করত বর্ত্তমান শ্যামদেশে। এখনো যারা ওখানে বাস করে তারা ঐ থেইস্‌দেরই বংশধর। বারংবার পরাজয়ের পর থেইসরা অবশেষে বিশেষ আয়োজন ক'রে ওঙ্কারধামকে হঠাৎ আক্রমণ করে।

একটা বড় যুদ্ধে তারা জয়ী হয়। জনৈক ভগ্নদূত সেই খবর নিয়ে ফিরে এল। ওঙ্কারধামের সেনাপতি বললেন, "তোমার খবর

---

*"And in Yasodharpura, which is the Great Capital of the Khmer people and the finest city in all of Asia, there is a statue of the Lord Buddha sitting upon the coiled cobra which is the emblem of that race. And this statue was fashioned out of emeralds so cunningly matched and cemented together that the whole work sums as one solid emerald and shines with a green light so intense that none but the faithful may look upon it."

মিথ্যা হ'লে তোমার প্রাণদণ্ড হবে। আর তোমার খবর সত্য হ'লেও তোমার প্রাণদণ্ড হবে। কারণ সবাই যখন বীরের মত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে, তখন তুমি কাপুরুষের মত পালিয়ে এসেছ!"

ভগ্নদূতের প্রাণদণ্ড হ'ল, কিন্তু ওঙ্কারধাম রক্ষা পেল না। পুরোহিতেরা নগর-রক্ষা অসম্ভব দেখে মরকত-বুদ্ধ, স্বর্ণ-শিবলিঙ্গ, অন্য অন্য মূল্যবান বিগ্রহ আর রাশি রাশি হীরে-মণি-মুক্তা তখনি সরিয়ে ফেলে গুপ্তস্থানে লুকিয়ে রাখলেন।

অনেকেরই দৃঢ়বিশ্বাস, বিজয়ী থেইস্‌রা সে-সব গুপ্তধন খুঁজে পায় নি।

ওঙ্কারধামের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আজও কত লোক সেই গুপ্তধন খুঁজে বেড়ায়! কিন্তু আজও কেউ তার ঠিকানা আবিষ্কার করতে পারে নি। আমাদের এই পদ্মবাগ-বুদ্ধ সেই গুপ্তধনেরই অংশবিশেষ কিনা, কে তা বলতে পারে?"

বৈকাল অতীত হয়ে গেছে, সূর্য্যালোক তখন অরণ্যের মাথার উপরে গিয়ে উঠেছে।

দিনের আলোয় চতুর্দ্দিক সমুজ্জ্বল বটে, কিন্তু এমন নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ যে, রাত্রির স্তব্ধতার সঙ্গে তুলনা করা চলে!

আরও মাইলখানেক পথ পেরিয়ে অমলবাবু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, "ঐ সেই সপ্ত-তালগাছ!"

সুন্দবাবু বললেন, "সপ্ত-তালগাছ আবার কি?"

—"ঐ হচ্ছে আমাদের পথের শেষ-নিশানা। পাশাপাশি ঐ যে সাতটা তালগাছ দেখছেন, ওর পরেই সেই ভাঙ্গা মন্দিরের প্রকাণ্ড বাঁধান চত্বর—অর্থাৎ আমাদের পথের শেষ!"

কিন্তু পথের শেষে এসে মাণিকের মনে জয়ন্তের শোক আরো বেশী ক'রে জেগে উঠল।

জয়ন্তের জন্যেই এদেশে আসা, পদ্মরাগ-বুদ্ধের জন্যে তার আগ্রহ

ছিল অফুরন্ত। জয়ন্ত নেই, তবু যে সে এখানে এসেছে, এ কেবল বন্ধুর ব্রত উদ্‌যাপন করবার জন্যে!

সে মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলে, যদি তাদের চেষ্টা সফল হয়, তবে অমলবাবুর হাতে পদ্মরাগ-বুদ্ধকে সমর্পণ ক'রে সে সর্ব্বাগ্রে চ্যান্ আর ইনকে গ্রেপ্তার করবে। যতদিন এই প্রতিজ্ঞা পালন করতে পারবে না, ততদিন সে স্বদেশে ফেরবার কথা মনেও আনবে না!

তারা সপ্ত-তালের তলায় এসে দাঁড়াল।

তারপর একটা বাঁশবনেব প্রাচীর পার হয়েই সকলে সবিস্ময়ে দেখলে, তাদের চোখেব সামনেই রয়েছে, চারিদিকে প্রায় দুই মাইল বিস্তৃত একটা মাঠ।

সেই মাঠের মাঝখানে পাথরে বাঁধান একটি প্রকাণ্ড চত্বর! এবং চত্বরের মাঝখানে একটি পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর এক কোণ দিয়ে যে রাস্তাটি পশ্চিম মুখে চলে গিয়েছে, তারই প্রান্তে দেখা যাচ্ছে মস্ত একটি পাথরেব মন্দিরেব কতক অংশ! মন্দিরের বাকি অংশ গাছপালার ভিতরে ঢাকা পড়েছে।

সকলে যখন পুকুব পাড়ে গিয়ে দাঁড়াল, সুন্দরবাবু বললেন, "এইবার পদ্মরাগ-বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করতে হবে। হুম্, বার কর তো মাণিক, তোমার সেই সোনার চাক্তিখানা!"

মাণিক পকেট থেকে চাক্তি বার ক'বে সুন্দরবাবুর হাতে দিয়ে বললে, "আপনিই তা'হলে নক্সার পাঠোদ্ধার ক'রে আমাদের বাহবা লাভ করুন!"

সুন্দরবাবু অবহেলা-ভরে বললেন, "পুলিশে চাকরি নিয়ে ঢের ঢের হেঁয়ালী জলের মত প'ড়ে ফেলেছি, এ তো সামান্য নক্সা মাত্র! হুম্! নক্সায় এই তো বয়েছে পুকুরটা, চারিদিকে এই তো চারটে ঘাটের সিঁড়ি! কিন্তু নক্সায় পুকুরের পশ্চিম কোণে এই যে তিন কোণা চিহ্নিত জায়গাটা রয়েছে, আসল পুকুরের পশ্চিম কোণে তেমন ধারা কিছুই তো দেখছি না!"

মাণিক হাসতে হাসতে বললে, "ওকি সুন্দরবাবু, এরি মধ্যে মাথা চুল্‌কোচ্ছেন কেন ?"

—"মাথা চুল্‌কোচ্ছি কি সাধে ? এ নক্সাখানা কেউ ঠাট্টা ক'রে আঁকেনি তো ?"

—"বোধ হয় না। আচ্ছা, দিনের আলো থাকতে থাকতে আগে মন্দিরের ভেতর চলুন! সেখানে গেলে হয়তো কোন হদিস্ পাওয়া যাবে!"

—"ঠিক বলেছ। তাই চল।"

দিনের আলো তখন নিবু-নিবু হবার সময় হয়েছে।

পাখীরা বিদায়ী গান গাইতে গাইতে বাসার দিকে ফিরতে সুরু করেছে। সূর্য্যের কিরণ আর দেখা যাচ্ছে না—যদিও অন্ধকারের ঘুম এখনো ভাঙে নি।

মাঝখানে প্রকাণ্ড এক মন্দির, তার উপর দিকটা ভেঙে পড়েছে।

দেখলেই বোঝা যায়, সম্পূর্ণ অবস্থায় এ মন্দিরটা অন্ততঃ একশো ফুটের কম উঁচু ছিল না।

মন্দিরের আগাগোড়া কারুকার্য্যে আর ছোট বড় মূর্ত্তিতে ভরা।

কিন্তু তার অধিকাংশই ভেঙে বা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে মহাকালের নির্দ্দয়তায়। বড় মন্দিরের চার পাশে যে চারিটি ছোট মন্দির ছিল, এখন তাদের সামান্য চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট আছে। এখানে যেদিকেই তাকানো যায়, কেবলই ধ্বংসের লীলা স্তম্ভিত হয়ে আছে মৃত্যু-স্তব্ধতার কোলে। মন নেতিয়ে পড়ে, প্রাণ হা-হা করে, চোখে বিষণ্ণতা জাগে।

সকলে ধীরে ধীরে মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করল।

মন্দিরের ভিতরে তখন আলো-আঁধারের খেলা আরম্ভ হয়েছে সহজে দূরের জিনিষ স্পষ্ট চোখে পড়ে না।

চূড়া ভেঙে পড়েছে ব'লে উপর-পানে তাকিয়ে দেখা গেল,

পশ্চিমের আরক্ত রাগে রঞ্জিত নীলাকাশকে।

মন্দির-গর্ভ খুব প্রশস্ত, তার মধ্যে বড় বড় অনেকগুলো হল-ঘরের ঠাঁই হ'তে পারে।

ভিতরের চারিকোণে চারিটি মানুষের চেয়েও ডবল বড় 'অবলোকিতেশ্বর' বুদ্ধের দণ্ডায়মান মূর্ত্তি। একটি মূর্ত্তি কতকটা অটুট আছে, বাকি মূর্ত্তি তিনটির কারুর দেহের উপরিভাগ নেই, কারুর পদযুগল নেই, কারুর মুণ্ড নেই। দেওয়ালেও খোদিত ভাস্কর্য্য কাজ আছে, কিন্তু অস্পষ্ট আলোতে ভাল ক'রে দেখা যায় না।

মন্দিরের পশ্চিম দেওয়ালে সামনে প্রকাণ্ড একটি মূর্ত্তিশূন্য বেদী রয়েছে কালো পাথরে গড়া। সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে অমলবাবু বললেন, "ওরই উপরে আমরা সেই ছোট্ট বুদ্ধ মূর্ত্তিটি পেয়েছিলুম।"

মাণিক একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "অতটুকু একটি মূর্ত্তির জন্যে এত বড় একটা মন্দিরের এত-বড় কালো পাথরের বেদী গড়া হয়েছিল! সে মূর্ত্তি কখনো এমন মন্দিরের প্রধান দেবতা হ'তে পারে না!"

অমলবাবু বললেন, "আমারও সেই সন্দেহ হয়। বিশেষ, মন্দিরের অপ্রধান মূর্ত্তিগুলিই যখন এমন প্রকাণ্ড! আমার বিশ্বাস, বেদীর উপর থেকে প্রধান মূর্ত্তিটিকে হয়তো কোন কারণে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। পরে পূজার বেদীতে দেবতার অভাব কতকটা দূর করবার জন্যে কোন ভক্ত এই মূর্ত্তিটিকে স্থাপন করেছিল!"

—"খুব সম্ভব, তাই।"

সুন্দরবাবু এতক্ষণ নির্ব্বাক ও হতভম্বের মত নক্সার সঙ্গে বেদীটি মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করছিলেন।

অমলবাবু তাঁর অবস্থা দেখে হেসে বললেন, "কি সুন্দরবাবু নক্সা দেখে কিছুই বুঝতে পারছেন না তো? আমিও পারিনি!"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্, এ হচ্ছে একখানা বাজে নক্সা! কোন

ধাপ্পাবাজের আঁকা! আমরা সবাই হচ্ছি মহা হাঁদা-গঙ্গারাম, একটুকরো হিজিবিজি দেখে যমালয়ের রাস্তায় ছুটে এসেছি! পদ্মরাগ-বুদ্ধ! সোনার পাথর-বাটি! যা নয় তাই!"

মাণিক চাক্তিখানা সুন্দরবাবুর হাত থেকে নিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল।

মন্দিরগর্ভে অন্ধকার তখন আলোকের শেষ আভাটুকুও নিবিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল।

সেই মহা-নির্জ্জনতার স্বদেশে, সেই মান্ধাতার আমলের মন্দিরের প্রাচীন স্তব্ধতা যেন ঘনায়মান ও হিংস্র অন্ধকারের মূর্ত্তি ধ'রে সকলের প্রাণমনের উপরে চেপে বসতে চাইছিল!

উপরদিকে হঠাৎ ঝট্‌পট্ ঝট্‌পট্ শব্দ হ'ল—নিরবচ্ছিন্ন নীরবতার মাঝখানে সেই শব্দগুলোকে শোনালো যেন বন্দুকের আওয়াজের মত!

চমকে এবং দোদুল ভুঁড়ি নাচিয়ে লাফিয়ে উঠে সুন্দরবাবু সভয়ে ঊর্দ্ধমুখে দেখলেন, ভাঙা মন্দিরের ফাঁকে তখনো উজ্জ্বল আকাশপটে কালো কালো চলন্ত দাগ কেটে কি-কতকগুলো উড়ে গেল।

অমলবাবু বললেন, "চামচিকে।"

সুন্দরবাবু বললেন, "না, অন্ধকারের কালো বাচ্ছা!"

মাণিক নিজের মনেই বললে, "নক্সায় বেদীর গায়ে সিঁড়ি আঁকা রয়েছে। কিন্তু এখানে কোথায় সিঁড়ি?"

সুন্দরবাবু বললেন, "প্রতিধ্বনিও বলবে—কোথায় সিঁড়ি? ও সিঁড়িফিড়ি কিছুই পাওয়া যাবে না, আমাদের কাদা ঘেঁটে মরাই সার হ'ল, জয়ন্ত বেচারা বেঘোরে প্রাণ দিলে, এখন তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালাই চল মাণিক।"

—"পালাবো, কেন?"

—"এ জায়গাটা ভালো নয়! আমার বুক ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করছে! হুম্, আমর বুক অকারণে ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করে না। এটা নিশ্চয়ই

হানা মন্দির !”

মাণিক হেসে উঠল—তার হাস্যধ্বনি মন্দিরের অন্ধকার-ভরা কোণে কোণে প্রতিধ্বনি তুললে, শোনালো ঠিক অন্ধকারের হাসির মত !

সুন্দরবাবু অস্বস্তিপূর্ণকণ্ঠে বললেন, “তুমি হেসো না মাণিক। এমন অস্বাভাবিক স্তব্ধতা তুমি কখনো অনুভব করেছ ? একমাইল দূরে একটা আল্‌পিন পড়লেও যেন শোনা যায় ! এ স্তব্ধতা যেন নিরেট, হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় ! এ স্তব্ধতা যেন ওজনে ভারি—বুকে জাঁতাকলের মত চেপে বসে ! এ যেন স্তব্ধতার মহাসাগর,—আমাদের কথাগুলো যেন মুখ থেকে বেরিয়েই এই স্তব্ধতার অতলে তলিয়ে যাচ্ছে !”

মাণিক কোন কথায় কান না পেতে মন্দিরের বেদীর উপরে হাত বুলোতে লাগল। তারপব ফিবে বললে, “অমলবাবু, এ বেদীর গায়ে কখনো যে কোন সিঁড়ি ছিল, তার চিহ্নটুকুও দেখছি না ! অথচ নক্সায় সিঁড়ি আঁকা রয়েছে ! এর মানে কি ?”

—“আমার বোধ হয় এ নক্সাখানা অন্য কোন জায়গার !”

—“অসম্ভব ! নক্সার সঙ্গে এখানকার বাকি সমস্তই হুবহু মিলে যাচ্ছে ! এই সিঁড়ির হয়তো কোন গুপ্ত অর্থ আছে।”

—“থাকতে পারে। কিন্তু আমবা কেউ তা জানি না। সুতবাং আমাদের পক্ষে ও-গুপ্তঅর্থ থাকা-না-থাকা দুই-ই সমান।”

হঠাৎ সুন্দরবাবু আঁৎকে ব’লে উঠলেন, “মাণিক, মাণিক ! কে যেন এখানে চাপা হাসি হাস্‌ছে !”

মাণিক বললে, “কৈ ?”

—“হাসি আবার থেমে গেল !”

—“ও আপনাব মনের ভুল। আমি কোন হাসি শুনি নি।”

—“অমলবাবু, আপনিও শোনেন নি ?”

—“না। কে আবার হাসবে, এখানে আমরা তিনজন ছাড়া

আর কেউ নেই।"

—"হুম্, শুনিনি বললেই হল? আমি স্পষ্ট শুনেছি! কে যেন লুকিয়ে লুকিয়ে হাসি চেপে রাখবার চেষ্টা করেও পারলে না!"

—"তাহ'লে আপনার পিছনে ঐ যে বুদ্ধদেব দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁকে জাগ্রত বলে মানতে হয়! আপনার ভয় দেখে উনিই হেসে ফেলেছেন!"

সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি ত্ন পা পিছিয়ে এসে ফিবে তাকালেন।

আসন্ন সন্ধ্যার আবছায়া মেঘে প্রকাণ্ড 'অবলোকিতেশ্বর' দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর প্রস্তব-চক্ষুর প্রশান্ত দৃষ্টি যেন সুন্দরবাবুর মুখের পানেই তাকিয়ে আছে এবং তাঁর ওষ্ঠাধর স্নিগ্ধহাস্যে বিকশিত!

সুন্দববাবু বিস্ফারিত আড়ষ্ট চোখে দেখলেন, আচম্বিতে বুদ্ধমূর্ত্তি জ্যান্তো হয়ে টলমলিয়ে ন'ড়ে উঠল!

"হুম্, বাপ্!" ব'লে সুন্দরবাবু সুদীর্ঘ এক লাফ মেরে একেবারে মাণিকের ঘাড়ের উপরে এসে পড়লেন!

অমলবাবু উত্তেজিত ষরে বললেন, "বুদ্ধদেব ন'ড়ে উঠেছেন মাণিক! আমি স্বচক্ষে দেখেছি!"

মাণিক বিস্মিতভাবে তাকিয়ে দেখলে, মূর্ত্তি যেমন স্থির ছিল তেমনই বয়েছে! সে ভৎর্সনার স্বরে বললে, "আপনারা ত্নজনেই পাগল হলেন নাকি?"

সুন্দরবাবু ঠক্-ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "পাগল এখনো হইনি মাণিক, কিন্তু পাগল হ'তে আর বেশী বিলম্ব নেই! পাথরের মূর্ত্তি হাসে, পাথরের মূর্ত্তি নড়ে, এমন ব্যাপার কেউ কখনো দেখেছে?"

মাণিক এগিয়ে বুদ্ধমূর্ত্তির গায়ে হাত রেখে বললে, "এই দেখুন, আমি মূর্ত্তির গায়ে হাত দিয়েছি! একেবারে জড় পাথর, এর মধ্যে কোন প্রাণ নেই!"

হঠাৎ সেই প্রস্তরমূর্ত্তি একখানা জীবন্ত ও বলিষ্ঠ বাহু বাড়িয়ে সবলে মাণিকের হাত চেপে ধরলে !

আকস্মিক আতঙ্কে আচ্ছন্ন হয়ে মাণিক প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল, "সুন্দরবাবু ! অমলবাবু !"

নূতন
বিপদ

যদিও দূব থেকে অন্ধকারে কিছু দেখা গেল না, তবু সাহসী মাণিককে অমন ভাবে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠতে দেখে সুন্দরবাবু তখনি বুঝে নিলেন যে, ভয়ঙ্কর ভুতুড়ে কোন ঘটনা ঘটেছে! মাণিককে সাহায্য করবেন কি, তিনি নিজেই প্রায় মূর্চ্ছিত হয়ে সেইখানে ব'সে পড়লেন, পালাবার শক্তি পর্য্যন্ত রইল না!

অমলবাবুর অবস্থাও তথৈবচ।

মাণিক দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজের হাতখানা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না!

যে-হাতখানা এমন বজ্র-মুষ্টিতে তার হাত চেপে ধরেছে তা কিন্তু পাথরের নয়, রক্তমাংসে গড়া মানুষের হাত!

মাণিক তাড়াতাড়ি ৭।-হাতে নিজের কোমরবন্ধ থেকে ধারালো ছুরিখানা টেনে বার ক'বে ফেললে।

—এবং সঙ্গে সঙ্গে সুপরিচিত স্নিগ্ধ কণ্ঠে শোনা গেল, "মাণিক, ছুরি দিয়ে কি তুমি আমার হাতখানা কেটে ফেলতে চাও?"

বিষম বিস্ময়ে মাণিক চেঁচিয়ে উঠল, "জয়ন্ত!"

—"হ্যাঁ বন্ধু, আমি সেই পুরাতন জয়ন্তই—আপাততঃ যমালয়ের ফের্ত্তা মানুষ।"

বলতে বলতে বুদ্ধমূর্ত্তির পিছন থেকে স্বশরীরে সকলের চোখের সামনে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল হাস্যমুখে জয়ন্ত!

অমলবাবু একেবারে থ হয়ে গেলেন। এ যে জয়ন্তের প্রেতাত্মা সে সম্বন্ধে সুন্দরবাবুর কোনই সন্দেহ রইল না! তিনি প্রায় কাঁদ কাঁদ মুখে দুইহাতে নিজের চোখ ঢেকে ফেললেন, কারণ তাঁর পক্ষে

এমন স্বচক্ষে প্রেতদর্শন অসম্ভব !

মাণিক বিস্ময়ে আনন্দে ও উচ্ছ্বাসে প্রায় অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, "জয় ! জয় ! তুমি ! তুমি বেঁচে আছ !"

—"এক ভালো গণৎকার হাত দেখে বলেছিল, আমার পরমায়ু আশী বৎসর। অসময়ে মরিনি ব'লে বিস্মিত হচ্ছ কেন ভাই !"

—"কিন্তু তোমার সেই গুলিতে ছ্যাঁদা টুপী, জমির উপরে দু-জায়গায় রক্তের দাগ, তোমার অন্তর্দ্ধান,—এ-সবের অর্থ কি !"

—"মাণিক, এতদিন আমার সঙ্গে থেকেও তোমার পর্য্যবেক্ষণ শক্তি যে বাড়ল না, এ বড় দুর্ভাগ্যের কথা ! জমির উপরে রক্তের দাগ আর ছ্যাঁদা টুপী দেখেই হাল ছেড়ে দেওয়া তোমার উচিত হয় নি। তুমি আমার পায়ের মাপ জানো ! যেখানে আমার টুপীটা পড়ে ছিল, সেখানে তুমি যদি আমার পদচিহ্ন পরীক্ষা করতে, তাহ'লে স্পষ্ট দেখতে যে আমি দু-পায়ে হেঁটে পাশের জঙ্গলের ভিতর গিয়ে ঢুকেছি ! আর, যেখানে অনেকটা রক্ত ছিল, সেখানটা খুঁজলে তুমি আমার পায়ের দাগ দেখতেই পেতে না, কারণ সেখানে আমি একবারও যাই নি !"

—"তবে !"

—"আমি যখন বাংলোর দিকে ফিরছিলুম, তখন শত্রুরা অতর্কিতে আমাকে আক্রমণ করে। প্রথমেই বন্দুক ছুঁড়ে আমি তাদের একজনকে মাটিতে পেড়ে ফেলি বটে, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তাদের বন্দুকের একটা গুলি আমার টুপী ভেদ ক'রে মাথার খানিকটা ছাল তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি তৎক্ষণাৎ আত্ম-রক্ষার জন্য মাটিতে আছড়ে প'ড়ে চির-পুরাতন কৌশল অবলম্বন—অর্থাৎ মৃত্যুর ভাণ করলুম। তারপর দশএগারজন লোক আমার কাছে ছুটে এল ! আমার জামা হাতড়ে সেলাই করা পকেট কেটে সোনার চাক্তিখানা বার ক'রে নিলে। এমন সময় তোমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে তারা তাদের মৃত বা আহত সঙ্গীকে মাটি থেকে

তুলে নিয়ে পালিয়ে গেল। আমিও উঠে জঙ্গলের ভিতরে অদৃশ্য হলুম।”

—“কেন ?”

—“আমি জানতুম, তোমরা এই মন্দিরের দিকে আসবেই, আর শত্রুরা তোমাদের পিছু নেবে—কারণ চাবি তারা পায় নি। স্থির করলুম, আমিও লুকিয়ে তাদের উপরে পাহারা দেব, যাতে তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে না পারি। তারা জানে আমি বেঁচে নেই। সুতরাং আমি যে তাদের পিছু নিয়েছি, এ-সন্দেহ তারা করবে না। তোমাদের সঙ্গে থাকলে আমার এ সুবিধা হ'ত না, আমিও জানতে পারতুম না যে, রাত-আঁধারে বন-বাদাড়ে বিপদ আসবে কোন্ দিক থেকে !”

—“এতক্ষণে বুঝলুম, চ্যানের হাত থেকে কে আমাকে বাঁচিয়েছে!”

—“হ্যাঁ, ওঙ্কারধামে চ্যান্ যখন তোমার গলা টিপে ধরে, আমি ছুটে গিয়ে বন্দুকের কুঁদোর বাড়ি তার মাথায় মারি। সে তখন ছোরা বার ক'রে আমাকে আক্রমণ করতে আসে। আমি যুযুৎসুর এক প্যাঁচ্ কষ্‌তেই সে জমি আশ্রয় করলে—আর পড়বার সময়ে চ্যানের নিজেরই ধারালো ছোরায় তার বাঁ-হাতের একটা আঙুল গেল উড়ে। সেই সময়েই তার কাছ থেকে সোনার চাক্তিখানা আমি আবার কেড়ে নি। চান বেগতিক দেখে চম্পট দেয়। সোনার চাক্তি তোমাদের দরকার হবে বুঝে সেখানা তোমার বুকের উপর রেখে আমিও অদৃশ্য হই! আমি জানতুম, তোমাদের দলের কেউ না কেউ সেখানে দেখতে পাবেই!”

—“কিন্তু জয়ন্ত, তুমি কি অনাহারে আছ ?”

—“মোটেই না। এখানকার নদী জলহীন আর গাছ ফলহীন নয়!……… হ্যাঁ, ভালো কথা! এইবার আমার একটা জিজ্ঞাসা আছে। সেই মাঠে শত্রুদের গতিরোধ করবার বুদ্ধি তোমাদের

কার মাথায় প্রথমে আসে ?"

—"প্রস্তাব করেছিলুম আমি, সমর্থন করেছিলেন সুন্দরবাবু।"

—"বাহবা, চমৎকার! মাণিক, তুমি যে চাল চেলেছ, তা অতুলনীয়! এই এক চালেই তোমরা নিরাপদ হয়েছ। আমিও তারপরেই তোমাদের চেয়েও দ্রুতপদে এগিয়ে এই মন্দিরে এসে গা-ঢাকা দিয়েছিলুম।"

সুন্দরবাবু অপ্রসন্ন মুখে বললেন, "হুম্, বেশ করেছিলে! কিন্তু আমাদের ভয় দেখাচ্ছিলে কেন ?"

—"মোটেই ভয় দেখাই নি। আপনার ছেলেমানুষী ভয় দেখে আমি হাসি চাপতে গিয়েও পারলুম না, আর তাই শুনেই আপনি একেবারে ক্ষেপে গেলেন!"

—"খামোকা ক্ষেপি নি। পাথরের বুদ্ধ জ্যান্তো হ'লে কে না—"

—"মূর্ত্তিটাই নড়্‌বোড়ে। কতকালের পুরোনো ভাঙ্গা মূর্ত্তি, হাত দিলেই নড়ে। বিশ্বাস না হয়, আপনি একবার হাত দিয়ে ঠেলে দেখুন না!"

—"না, আমি হাত দিয়ে ঠেলে দেখতে চাই না, আমি এখান থেকে পালাতে চাই!"

—"সে কি, এখনি পালাবেন কোথায় ? এখনো যে পদ্মরাগ-বুদ্ধ লাভ হয়নি!"

—"হ্যাঁঃ! সে লাভের আশায় গয়া! সে নক্সার কোন মানে হয় না! এখন 'লাভে ব্যাং অপচয়ে ঠ্যাং' করেই আমাদের মুখ শুকিয়ে ঘরপানে ফিরতে হবে!"

—"সুন্দরবাবু, নক্সার মানে আমি বুঝেছি বলেই কলকাতা থেকে এত দূরে ছুটে এসেছি!"

অমলবাবু সবিস্ময়ে বললেন, "নক্সার মানে বুঝেই আপনি এখানে এসেছেন ?"

—"হ্যাঁ অমলবাবু! কলকাতাতেই যখন আমি আপনার মুখে

শুনলুম যে, নক্সার সিঁড়ি আছে অথচ বেদীর গা ব'য়ে কোন সিঁড়ি আপনি দেখেন নি, তখনি তার অর্থ বোঝবার চেষ্টা করেছিলুম! এখন দেখা যাক, আমার আন্দাজ ঠিক কিনা!......(উচ্চস্বরে) ওহে হাতী সিং! তোমার লোকজন নিয়ে মন্দিরের ভিতরে এস! বড় অন্ধকার, আগে আলোগুলো জ্বালো!"

হাতী সিং সদলবলে বাহির থেকে ভিতরে এল। চারটে পেট্রলের লণ্ঠন জ্বালা হ'ল। এই প্রাচীন মন্দির হয়তো রাত্রে কখনো উজ্জ্বল আলো দেখবার সৌভাগ্যলাভ করে নি!

সুন্দরবাবু হাঁপ ছেড়ে বললেন, "আঃ, আলো দেখে ধড়ে প্রাণ এল! এখন দেখছি বাইরেই অন্ধকার! হুম্, আমি আর বাইরে পা বাড়াচ্ছি না!"

জয়ন্ত বললে, "বেদীটা এখানে এসেই আমি দেখে নিয়েছি। মাণিক, তুমি যদি বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ঘা মেরে পরীক্ষা করতে, তাহ'লে বেদীটা বুঝতে তোমার কোনই কষ্ট হ'ত না!...হাতী সিং! তোমার লোকজনদের কুড়ুল নিয়ে এই বেদীটা ভেঙে ফেলতে বল!"

হাতী সিংএর অনুচরেরা তখনি বেদী-ধ্বংসে প্রবৃত্ত হ'ল—অন্য সকলে বিপুল কৌতূহলে আগ্রহদীপ্ত চক্ষে তাদের কাণ্ড দেখতে লাগল।

জয়ন্ত বললে, "পাথরের বেদী যখন ফাঁপা, তখন ভিতরে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে!"

ঠং ঠঙা ঠং, ঠং ঠঙা ঠং—কুড়ুলের পর কুড়ুলের ঘা, অতি নিস্তব্ধ মন্দির ঘন ঘন শব্দে পরিপূর্ণ হয়ে যেন গম্-গম্ করে উঠল!

শব্দের চোটে সেই নড়্‌বোড়ে বুদ্ধমূর্ত্তি আবার কাঁপতে সুরু করেছে দেখে সুন্দরবাবুর গায়ে কাঁটা দিলে!

বেদীটা গাঁথা ছিল কয়েকখানা বড় বড় পাথর দিয়ে।

এক একখানা পাথর সরানো হয় আর দেখা যায় বেদীর তলা

ফাঁকা, কিন্তু অন্ধকার-ভরা গর্ত ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে!

জয়ন্ত বললে, "ব্যাস্, আর পাথর সরাতে হবে না! হাতী সিং, একটা লণ্ঠন উঁচু ক'রে তুলে ধর তো!"

হাতী সিং ভাঙা বেদীর গর্ত্তের উপরে একটা হাজার-বাতি লণ্ঠন তুলে ধরলে!

উঁকি মেরে দেখা গেল, গর্ত্তের ভিতর দিয়ে একসার পাথরের সিঁড়ি নীচের দিকে সোজা নেমে গিয়েছে!

জয়ন্ত উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে, "এখন বুঝতে পারছ তো মাণিক, যে-রহস্য চোখে দেখা যায় না, সোণার চাক্তির নক্সা তাই এঁকে রেখেছে? আমি গোড়াতেই এটা বুঝতে পেরেছিলুম। নক্সা যদি বাজে হ'ত, তাহ'লে অত সাবধানে, অত গোপনে, অত যত্ন ক'রে বুদ্ধমূর্ত্তির মধ্যে রক্ষা করা হ'ত না! পদ্মরাগবুদ্ধকে যদি প্রণাম করতে চাও, তাহ'লে আমার সঙ্গে এই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামবে চল!"

অমলবাবু অভিভূত কণ্ঠে বললেন, "জয়ন্তবাবু, আশ্চর্য্য আপনার বুদ্ধি!"

জয়ন্ত বললে, "বুদ্ধি হচ্ছে স্বাভাবিক, তা আশ্চর্য্য নয়। সব মানুষ যে তা ব্যবহার করতে পারে না, এইটেই হচ্ছে আশ্চর্য্য!"

সুন্দরবাবু খুঁৎ খুঁৎ করতে করতে বললেন, "তাইতো, এ যে আবার নতুন বিপদ দেখছি! ঐ পাতালের ভিতর ঢুকলে আবার বেরুতে পারব তো? ওখানে কোন্ ভয়ঙ্কর ওৎ পেতে আছে, তা কে জানে!"

মাণিক বললে, "তাহ'লে আমরা নীচে নামি, আপনি এইখানে ব'সে বিশ্রাম করুন।"

সুন্দরবাবু বললেন, "একলা? বাপ্‌রে, তাও কি হয়! 'পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে!' আমি তোমাদের সঙ্গে-সঙ্গেই থাকবো—যা থাকে কপালে! হুম্!"

জয়ন্ত বললে, "আমাদের সঙ্গে আটটা পেট্রলের লণ্ঠন আছে। সবগুলোই জ্বেলে ফ্যালো। পাতালের অন্ধকারে যত আলো তত ভালো।"

সামনে, মাঝখানে, পিছনে প্রদীপ্ত লণ্ঠন নিয়ে সকলে একে একে সেই নিম্নগামী সোপানশ্রেণী দিয়ে নামতে লাগল।

পরে পরে কুড়িটি ধাপ নেমে সিঁড়ি শেষ হ'ল।

তারপর দেখা গেল, একটি সমতল পথ সোজা এগিয়ে দূরের অন্ধকারের ভিতরে হারিয়ে গিয়েছে।

পথটাও পাথরে বাঁধানো এবং নিতান্ত অপ্রশস্ত নয়, তিনজন লোক পাশাপাশি চলতে পারে।

গুহাপথের সেই যুগে যুগে সঞ্চিত নিবিড় তিমির সহসা আজ আলোকের আঘাতে যেন মৌন চীৎকারে আর্ত্তনাদ ক'রে পায়ে পায়ে দূরে স'রে যেতে লাগল, সভয়ে!

সেখানকার বহুকালব্যাপী নিদ্রিত স্তব্ধতাও আজ এতগুলো আধুনিক জুতার খট্ খট্ শব্দে যেন অত্যন্ত যাতনায় ধড়্‌ফড়্ করতে করতে ম'রে গেল!

সুন্দরবাবু সঙ্কুচিত সন্দেহে গুহাপথের বদ্ধ-হাওয়া সশব্দে শুঁকতে শুঁকতে বললেন, "হুম্! আলিপুরের চিড়িয়াখানায় গিয়ে যে-গন্ধ পাই, এখানেও আমি যেন সেইরকম দুর্গন্ধই পাচ্ছি।"

অমলবাবু বললেন, "এ গুহাপথ কতকাল বন্ধ আছে তা কে জানে! হয়তো আপনি বিষাক্ত বাষ্পের গন্ধ পাচ্ছেন!"

—"উঁহু, এ বাষ্প-টাষ্প'র গন্ধ নয়!"

মাণিক বললে, "তাহ'লে এটা বোধ হয় ভূতের গায়ের দুর্গন্ধ!"

সুন্দরবাবু চ'টে বললেন, "ঠাট্টা কোরোনা মাণিক, ও-রকম ঠাট্টা আমি পছন্দ করি না! হুম্! এখানে যে ভূত নেই তা কি ক'রে জানলে? ভূতের পক্ষে এটা হচ্ছে অতি মনোরম স্থান! আলো নেই, হাওয়া নেই, শব্দ নেই, এখানে থাকবে না তো ভূত কোথায়

থাকবে ?"

মাণিক আবার টিপ্পনি কাটলে, "কেন, আপনার মাথার ভিতরে ! আপনার মাথাটি হ'চ্ছে ভূতের স্বদেশ ! ওখানে নিত্যনতুন ভূতের জন্ম হয় !"

জয়ন্ত সর্ব্বাগ্রে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে প'ড়ে গম্ভীর স্বরে বললে, "সাবধান ! আর কেউ এগিও না !"

প্রত্যেকেই সচমকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, কেবল সুন্দরবাবু পায় পায় পিছু হটতে লাগলেন এবং একেবারে সকলের পিছনে না গিয়ে আর থামলেন না !

মাণিক বললে, "কি ব্যাপার, জয় ?"

—"কি-রকম একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে !"

মাণিক কান পেতে শুনতে লাগল। হ্যাঁ, একটা অদ্ভুত শব্দ শোনা যাচ্ছে বটে ! কেবল অদ্ভুত নয়, ভয়াবহ !

—"ও কিসের শব্দ, জয় ?"

—"ঠিক বুঝতে পারছি না ! পাথরের উপর দিয়ে কারা যেন অনেকগুলো বস্তা টেনে নিয়ে যাচ্ছে ! .....না, যাচ্ছে নয়, টান্‌তে টান্‌তে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে !"

সুন্দরবাবু মাথার ঘাম মুছতে মুছতে কাতর ভাবে মনে মনে বললেন, "হা ভগবান ! এই ডান্‌পিটে ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে এদেশে এসে কি ভুলই করেছি ! আর কি দেশে ফিরতে পারব ? হুম্‌ !"

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

একটা অজ্ঞাত, অপার্থিব বিপদের আশঙ্কায় সকলের হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল!

এতকালের বদ্ধ আলোহারা বায়ুহারা সুড়ঙ্গপথ, সমাধির চেয়েও যা সুরক্ষিত ও সুদুর্গম, তার মধ্যে বস্তা টেনে শব্দের সৃষ্টি করছে কে বা কারা? আর এদিকেই বা এগিয়ে আসছে কেন? যার মধ্যে জীবন্ত জীবের আবির্ভাব অসম্ভব, সেখানে এ কী অভাবিত ব্যাপার?

জয়ন্ত চুপি চুপি বললে, "মাণিক, ব্যাপার বড় সুবিধের নয়, বন্দুক তৈরি রাখো!"

সুড়ঙ্গ-পথের ভিতরে তার চুপি-চুপি কথাই শোনালো চীৎকারের মত!

সুন্দরবাবু বললেন, "হ্যাঁ, বন্দুকই তৈরি রাখবে বটে! এই পাতালপুরে কোন্ কুম্ভকর্ণের ব্যাটা কত শত বৎসর ধ'রে ঘুমিয়ে ছিল, মজার মজার স্বপ্ন দেখে আরাম করছিল, এখন অসময়ে এখানে অনধিকার প্রবেশ ক'রে দিলুম আমরা তার ঘুম ভাঙিয়ে! বন্দুক ছুঁড়ে করবে কি? বন্দুকের গুলিও তো হজ্‌মী গুলির মত কপ কপ্ ক'রে গিলে ফেলবে!"

জয়ন্ত ও মাণিক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল!

বস্তাটানার মত শব্দ ক্রমেই বেড়ে উঠছে! সেইসঙ্গে আরও একটা বেয়াড়া আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। কে যেন মাটির উপরে দুম্-দুম্ ক'রে খুব ভারি ভারি জিনিষ আছ্‌ড়ে ফেলছে অত্যন্ত অধীর ভাবে!

জয়ন্ত এ সব শব্দের কোন হদিস্ খুঁজে পেলে না! এ যে কার আস্ফালনের শব্দ!

অমলবাবু রুদ্ধশ্বাসে বললেন, "জয়ন্তবাবু, সেকালে গুপ্তধন রক্ষা করবার জন্যে যক্ রাখা হত ব'লে প্রবাদ শুনেছি! তা কি তবে সত্যি? যে আসছে সে কি যক?"

জয়ন্ত বললে, "পদ্মরাগ-বুদ্ধ হচ্ছেন অহিংসার দেবতা! এখানে যক রাখা মানে একটি জীবের প্রাণবধ করা। কোন বৌদ্ধ পুরোহিত সে-মহাপাপ করতে পারেন না। যকের কথা সত্যি কিনা জানি না,—সত্যি না হওয়াই সম্ভব, তবে সত্যি হ'লেও এখানে যক কেউ রাখে নি।"

—"তবে ও কে আসছে?"

—"ভগবান জানেন!"

এইবার ভীষণ একটা গর্জ্জন শোনা গেল!

বদ্ধ সুড়ঙ্গের আবহাওয়ায় বিকৃত হয়ে সেই ভয়াবহ ধ্বনি-প্রতিধ্বনি এমন অদ্ভুত শোনালো যে, সেটা কিসের গর্জ্জন কিছুই বোঝা গেল না।

সুন্দরবাবু হাল ছেড়ে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "হুম্! ক্রমাগত চম্‌কে চম্‌কে আজ মারা পড়ব নাকি? আমার আর সহ্য হচ্ছে না—চললুম আমি উপরে! এর চেয়ে ওপরের অন্ধকারে ব'সে ভয় পাওয়া ভালো, বনের বাঘ-ভাল্লুকের পেটে যাওয়া ভালো!"

তিনি সুড়ঙ্গ-মুখের দিকে চোঁচা দৌড় মারলেন।

সুড়ঙ্গ-পথের অনেক দূরে, যেখানকার নিরেট অন্ধকারের গায়ে ঠেকে লণ্ঠনের আলো ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, সেইখানে ফুটে উঠল বিদ্যুৎ-খণ্ডের মত দুটো জ্বলন্ত চক্ষু!

সে বিচিত্র চোখ দুটো নিষ্পলক, তার আগুন একবারও নিবছে না!

জয়ন্ত বললে, "আজ আর গোঁয়ারতুমি করা নয়! মাণিক, আজ

আমাদের ফিরতেই হবে—এখনো সময় আছে! সকলে মিলে পরামর্শ ক'রে কাল সকালে আবার ফিরে আসা যাবে! চল, আমরা বাইরে যাই!"

—"কিন্তু ও-সব কিসের শব্দ, ও কার গর্জ্জন, ও কার চোখ কিছুই তো বোঝা গেল না!"

—"বুঝতে গেলে প্রাণ দিতে হয়! শীগ্‌গির উপরে চল!"

সকলে দ্রুতপদে উপরে উঠে দেখলে, ভাঙ্গা বেদীর গায়ে হেলান দিয়ে মড়ার মত হল্‌দে মুখে সুন্দরবাবু চুপ ক'রে বসে আছেন।

মাণিক বললে, "সুন্দরবাবু, আজ আপনারই জয়জয়কার। পলায়নে আপনি হয়েছেন আমাদেব পথপ্রদর্শক।"

সুন্দরবাবুর তখন উত্তর দেবারও শক্তি ছিল না।

জয়ন্ত বললে, "আমাদের এখানে থাকাও নিরাপদ নয়। সুড়ঙ্গের মুখ খোলা, দপ্‌দপে চোখ নিয়ে যে আমাদের দেখেছে সে এখানেও খুঁজতে আসতে পারে! চল, আমরা মন্দিরের পিছনে বনের ভিতরে যাই। আজকেব রাতটা গাছের উপরে উঠেই কাটাতে হবে!"

অমলবাবু বললেন, "তার চেয়ে পাথরগুলো আবার যথাস্থানে রেখে গর্ত্ত আবার বন্ধ ক'রে দিলে কি হয় না?"

—"না। পাথর তো এখন আর গেঁথে দেওয়া সম্ভব নয়! সুড়ঙ্গে যার সাড়া পেয়েছি তার আকার নিশ্চয়ই অসাধারণ! ঐ আলগা পাথরগুলো তার এক ধাক্কায় হুড়্‌মুড়্‌ ক'রে ঠিকরে পড়বে!"

সুন্দরবাবু এতক্ষণে ভাষা পেয়ে বললেন, "জয়ন্তের প্রস্তাবই যুক্তিসঙ্গত। পথ খোলা পেলে ও-দানবটা হয়তো গর্ত্ত ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে যেতেও পারে!"

জয়ন্ত বললে, "ভগবান করুন, আপনার অনুমানই যেন সত্যি হয়! ও-পাপ বিদেয় হ'লে তো সব ল্যাঠা চুকে যায়!"

সুড়ঙ্গের গর্ভ ভেদ ক'রে আবার একটা বুকের-রক্ত-ঠাণ্ডা-করা

গভীর গর্জ্জন বাইরে ছুটে এল!

সে গর্জ্জনের সঙ্গে জড়ানো রয়েছে যেন বিষম ক্রোধ ও বিপুল ক্ষুধার ভাব! যেন আসন্ন মৃত্যুর গর্জ্জন, শুনলেই বুকের ভিতরে জীবনের স্পন্দন স্তম্ভিত হয়ে যায়!

জয়ন্ত সচকিত কণ্ঠে বললে, "সে আসছে, সে আসছে! তোলো সব তল্পিতল্পা, ছোটো বনের দিকে!"

রাত তখন বেশী নয়, কিন্তু এরি মধ্যে বনবাসিনী নিশীথিনীর নিষুটী-মন্ত্রে চতুর্দ্দিকের নির্জ্জনতা যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

আকাশে চাঁদ নেই, অন্ধকারের সাম্রাজ্য আজ অপ্রতিহত। বাতাস যেন কাঁদতে কাঁদতে বয়ে আনছে দূর-বনের আর্ত্তধ্বনি।

মন্দিরের পিছনে একটি ছোট মাঠ। তারপর আবার অরণ্য।

সেইদিকে এগুতে এগুতে জয়ন্ত বললে, "মাণিক, ভাগ্যিস্ বুদ্ধি ক'রে সঙ্গে বিষাক্ত বাষ্পের বোমা এনেছিলুম!"

—"কেন বল দেখি?"

—"কাল সকালে সুড়ঙ্গের মধ্যেই বোমা ছুঁড়ে দেখব কোন ফল হয় কিনা।"

—"যদি ফল না হয়? যদি ওটা কোন জীব না হয়?"

—"মানে?"

—"ওটা কোন ভৌতিক কাণ্ড হওয়া কি অসম্ভব?"

—"মাণিক, শেষটা তুমিও কি সুন্দরবাবুর দলে ভিড়তে চাও?"

—"ঐ সুড়ঙ্গের মধ্যে পৃথিবীর কোন জীব বাঁচতে পারে?"

—"না পারাই স্বাভাবিক। কিন্তু ও যে পেরেছে, হয়তো তারও এমন কোন স্বাভাবিক কারণ আছে, যা আমাদের অজানা। ভূতের কথা মনেও এনোনা মাণিক! ভূতের গল্প পড়তে ভালো, কারণ অসম্ভবের দিকে মানুষের টান থাকে। কিন্তু ভূত নেই।"

বোধ হয় তখন শেষ-রাত।

আকাশে চাঁদের আভাস জেগেছে মাত্র। গাছের উপরে সকলে বসেছিল অর্দ্ধনিদ্রিত ও অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সুন্দরবাবুর নাসিকা রাত্রির স্তব্ধতা দূর করবার জন্যে কম চেষ্টা করছিল না। এমন কি মাণিকের মত হচ্ছে, তাঁর নাকের ডাকাডাকিতে ভয় পেয়ে সে গাছের সব পাখী ও বানর তো দূরের কথা, এমন কি ভূত-পেত্নীরাও নাকি অন্য গাছের সন্ধানে পালিয়ে গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে!

আচম্বিতে উপর-উপরি দু-দুবার বন্দুকের শব্দে সকলের তন্দ্রা গেল ছুটে!

সুন্দরবাবু বেজায় চম্‌কে বিনা বাক্যব্যয়ে ঝুপ ক'রে ডাল থেকে প'ড়ে গেলেন। কিন্তু তিনি বিলক্ষণ হুঁসিয়ার ব্যক্তি ব'লে ধরাতলে অবতীর্ণ হবার আগেই খপ্‌ ক'রে আর-একটা ডাল ধ'রে ফেলে শূন্যে দুলতে ও ঝুলতে লাগলেন।

রাতের মর্ম্ম ভেদ ক'রে নানা কণ্ঠের চীৎকার ও আর্ত্তনাদ দূর থেকে ভেসে এল!

কারা যেন ভয়ানক আতঙ্কে চীৎকার করছে এবং দারুণ যাতনায় কাঁদছে।

—"জয়! জয়!

—"কী মাণিক?"

—"শুনেছ?"

—"হুঁ!"

—"আমাদের এখন কি করা উচিত?"

—"চুপ ক'রে এইখানে ব'সে থাকা উচিত। এ অরণ্য এখন মৃত্যুর রাজ্য। নীচে নামলেই মরব।"

—"কিন্তু ও কিসের গোলমাল?"

—"কাল সকালে বুঝতে পারব। এখন আর কথা কোয়োনা। কথা কইলেও হয়তো বিপদকে ডেকে আনা হবে।"

নীচের ডাল থেকে করুণস্বর শোনা গেল, "হুম্! কিন্তু আমাকে যে কথা কইতেই হবে! গাছের ডাল ধ'রে আমি ঝুলছি। তোমরা সাহায্য না করলে আমি আর বেশীক্ষণ ঝুলতেও পারব না!"

অমলবাবুর সঙ্গে মাণিক কোনরকমে ডাল ব'য়ে সুন্দরবাবুর কাছে—অর্থাৎ মাথার উপরে গিয়ে হাজির হ'ল!

মাণিক বললে, "বৈজ্ঞানিকের মতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা গাছের ডাল ধ'রে ঝুলতে পারতেন। সে অভ্যাস ভুলে গিয়ে আপনি ভালো করেন নি সুন্দরবাবু!"

ডাল ধ'রে ঝুলতে ঝুলতে সুন্দরবাবু বললেন, "মাণিক, তোমার ঠাট্টা শুনলে অঙ্গ জ্বলে যায়! নাও, এখন আমাকে টেনে তুলবে, না বচন শোনাবে?"

উপর থেকে জয়ন্তের বিরক্ত ও গম্ভীর স্বর শোনা গেল, "ফের কথা কয়!"

দূরের কোন গোলমাল আর শোনা যায় না!

শব্দগুলো যেন স্তব্ধতাসাগরের মধ্যে কয়েকখণ্ড ইষ্টকের মত প'ড়েই ডুবে কোথায় তলিয়ে গেল! এখন সুধ্ কালো রাত করছে থম্-থম্, মুখর ঝিল্লী করছে ঝিম্-ঝিম্, বনের গাছ করছে মর্-মর্! এবং ম্লান খণ্ডচাঁদ নিবু-নিবু চোখে করছে উষার কোলে মৃত্যুর অপেক্ষা!......

গাছে গাছে পাখীর দল বনভূমির সবুজ জগতে দিকে দিকে উচ্ছ্বসিত আনন্দে রটিয়ে দিলে—জাগো লতা-পাতা, জাগো ফুল-ফল, জাগো অলি-প্রজাপতি! পূর্ব্বের শোভাযাত্রায় দিবারাণীর সোণার মুকুট দেখা দিয়েছে! জাগো সবাই!

সকালের প্রথম আলো কি শান্তিময়! সকালের নতুন বাতাস কি মিষ্টি! এই পৃথিবীতে কখনো যে কালো-কুৎসিত ভয়ময় রাত ছিল, তার কথা যেন মনেও পড়ে না!

সকলে একে একে গাছ ছেড়ে আবার মাটি-মায়ের কোল পেয়ে

আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলে।

সুন্দরবাবু বললেন, "আগে ষ্টোভে চড়িয়ে দাও চায়ের কেট্‌লি! কি জানি বাবা, যে-জায়গায় যাচ্ছি, জীবনে হয়তো আর চা খেতে হবে না! ওহে, 'এয়ার-টাইট্' টিনে তোমরা রসগোল্লা আর সন্দেশ এনেছিলে না? হুম্, ক্ষমা-ঘৃণা ক'রে গোটা দশ-বারো আমার দিকে ছুঁড়ে মেরো!"

জয়ন্ত বললে, "ঠিক কথা, আমি সুন্দরবাবুকে সমর্থন করি। ভালো ব্রেক্-ফাষ্ট্ মানুষের সাহস আর শক্তিকে দুগুণ ক'রে তোলে! মাণিক, নিয়ে এস রসগোল্লা-সন্দেশের টিন!"

জয়ন্তের কাঁধে হাত রেখে সুন্দরবাবু বললেন, "জয়ন্ত-ভায়া, এইজন্যেই তো তোমার সঙ্গে আমার বেশী ভাব! খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তোমার মত মনের মানুষ দুর্লভ!"

প্রাতরাশ শেষ ক'রে সকলে আবার ভাঙা মন্দিরের দিকে অগ্রসর হ'ল, সুন্দরবাবু আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বার কয়েক 'দুর্গা দুর্গা' ব'লে চেঁচিয়ে নিলেন!

মাণিক বললে, "সুন্দরবাবু, শ্রীদুর্গার কাণদুটি কালা নয়, অমন বিকটস্বরে না চ্যাচালেও তিনি শুনতে পাবেন!"

সুন্দরবাবু বললেন, "এই! ঠাট্টা সুরু হ'ল তো? আচ্ছা মাণিক, তুমি আমার পিছনে এত লাগো কেন বল দেখি?"

মাণিক মুচকে হেসে বললে, "আপনাকে বেশী ভালোবাসি কিনা!"

জয়ন্ত তার প্রিয় বাঁশের বাঁশীটি বার করেছে এবং ভৈরবী রাগিনীর লীলায় প্রভাতকে আরো সুন্দর ক'রে তুলে মাঠের উপর দিয়ে সব-আগে এগিয়ে চলেছে!

মাঠে ফুটেছে অজস্র ঘসের ফুল—কেউ সাদা, কেউ হল্‌দে।

আশেপাশে ঘুরে-ফিরে ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে খুব-ছোট-জাতের একরকম প্রজাপতি! মাঝে মাঝে তাদের কাছে বাহাদুরি

নেবার মৎলবে গঙ্গাফড়িং হাই-জাম্পের নানান কায়দা দেখাচ্ছে!

মাঠ পার হয়ে বাঁশী বাজাতে বাজাতে জয়ন্ত মন্দিরের দরজার উপরে উঠল।

বাঁশীতে বাজছিল তখন কোন গানের অন্তরা, কিন্তু হঠাৎ তার স্বর বোবা হয়ে গেল একেবারে!

মাণিক দূর থেকেই লক্ষ্য করলে, জয়ন্ত বাঁশীটি তাড়াতাড়ি পকেটে পুরে, পিঠে বাঁধা বন্দুকটা নামিয়ে নিলে! দেখেই সে ঝড়ের বেগে ছুটল!

সুন্দরবাবু বুঝলেন, আবার কোন অঘটন ঘটেছে! একটা দুঃখের নিঃশ্বাস ফেলে সঙ্গীদের দিকে ফিরে বললেন, "তোমরাও ছুটে এস!"—ব'লেই তিনি দৌড়তে লাগলেন!

অমলবাবু একান্ত নাচারের মতন বললেন, "হে ভগবান, আবার কি হ'ল? আর যে পারি না!"

মন্দিরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সকলে যে বীভৎস দৃশ্য দেখলে, ভাষায় তা ঠিকমত বর্ণনা করা অসম্ভব!

মন্দিরের মেঝের উপরে অনেকখানি জায়গা জুড়ে প'ড়ে রয়েছে বিরাট এক অজগর সাপ! এত-বড় অজগর দেখা যায় না বললেই হয়—লম্বায় সে হয়তো ত্রিশ ফুটের কম হবে না এবং দেহও তার অসম্ভব-রকম মোটা!

কিন্তু এই ভয়াবহ দৃশ্য অধিকতর ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে আর এক অভাবিত কারণে!

অজগরের বিপুল কুণ্ডলীর ভিতরে প্রায় রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়ে বন্দী হয়ে রয়েছে দুটো মানুষের মৃত দেহ!.........
তৃতীয় একটা দেহ অজগরের ল্যাজের কাছে মেঝের উপরে হাত পা ছড়িয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে—তার মাথাটা একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং তার পাশে প'ড়ে একটা ভাঙা বন্দুক!

অজগরটাও বেঁচে নেই—তারও মাথা ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে।

মন্দিরের ভিতরে যেদিকে তাকানো যায় সেইদিকে রক্ত আর রক্ত!

কোথাও প'ড়ে আছে চাপ চাপ রক্ত, কোথাও আঁকাবাঁকা রক্তের ধারা! রক্তের ফিন্‌কি মন্দিরের দেওয়ালেও গিয়ে লেগেছে!

এত রক্ত অমলবাবু এক জায়গায় কখনো দেখেন নি,—তাঁর মাথা ঘুরে গেল, প্রায় অজ্ঞানের মত তিনি ধপাস্‌ ক'রে বসে পড়লেন!

অনেকক্ষণ স্তম্ভিতের মতন দাঁড়িয়ে থাকবার পর জয়ন্ত ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললে, "তাহ'লে কাল আমরা এই অভাগাদেরই আর্ত্তনাদ শুনেছিলুম?"

মাণিক বললে, "তা ছাড়া আর কি!"

সুন্দরবাবু বললেন, "কিন্তু কে এরা?"

জয়ন্ত বললে, "বুঝতে পারছেন না? এরা যে আমাদেরই বন্ধু! আপনাদের গুলি খেয়েও এদের আশ মেটে নি, পদ্মরাগ-বুদ্ধের উপরে এদের এত ভক্তি যে, আমরা কি করছি দেখবার জন্যে রাত্রে মন্দিরে এসে ঢুকেছিল!"

অমলবাবু ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, "আমি চ্যান্‌ আর ইন্‌কে চিনতে পেরেছি। বন্দুকের পাশে' লোকটা হচ্ছে ইন্‌, আর অজগরের কুণ্ডলীর ভিতরে মুখ খিঁচিয়ে রয়েছে চ্যান্‌। অন্য লোকটাকে চিনি না।"

জয়ন্ত বললে, "সমস্ত ব্যাপারটাই বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।...... সাপ কখনো গর্ত্ত খোঁড়ে না, অন্য জীবের খোঁড়া গর্ত্তে সে আশ্রয় নেয়। কোন জন্তু উপর থেকে গর্ত্ত খুঁড়ে পদ্মরাগ-বুদ্ধের সুড়ঙ্গে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। অজগর-মহাপ্রভু সেই গর্ত্ত দিয়ে ভিতরে ঢুকে তাকে ফলার করেন আর তারপর থেকে মনের সুখে সুড়ঙ্গেই বাস করতে থাকেন। কাল রাত্রে উনিই আমাদেরও ফলার করবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু আমরা আত্মত্যাগে রাজি না হওয়াতে উনি বেরিয়ে এসে আমাদের অভদ্রতায় অত্যন্ত বিরক্ত আর ক্রুদ্ধ হয়ে

মন্দিরের ভিতরেই বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন, বা কোন কোণ বেছে নিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিলেন। তারপর কখন চ্যান্ আর ইন্ কোম্পানীর রঙ্গালয়ে প্রবেশ। তাদের চোখ তখন আমাদের জন্যেই ব্যস্ত, অজগরকে তারা দেখতে পায় নি, কিন্তু অজগর তাদের দেখেই আক্রমণ করলে! চ্যান্ আর তার একজন সঙ্গী প্রথম আক্রমণেই তার কুণ্ডলীর ভিতরে ধরা পড়ল, ইনের হাতে ছিল বন্দুক, সে অব্যর্থ লক্ষ্যে অজগরের মাথা টিপ ক'রে দুবার বন্দুক ছুঁড়লে, সঙ্গে সঙ্গে অজগরের বিষম ল্যাজের ঝাপটায় তার মাথা আর হাতের বন্দুক গেল গুঁড়িয়ে! বাকি যারা ছিল তারা করলে সবেগে পলায়ন! ব্যাপারটা বোধহয় অনেকটা এইরকমই হয়েছিল। ......অর্থাৎ আমাদের মানুষ-শত্রুর দল নিজেরাই আত্মবলি দিয়ে আমাদের অজগর-শত্রুকে বধ ক'রে আমাদের পথ সাফ ক'রে দিয়েছে! ভগবানকেও ধন্যবাদ, চ্যান অ্যাণ্ড্ ইন্ কোম্পানীকেও ধন্যবাদ! আর ধন্যবাদ দি পদ্মরাগ-বুদ্ধদেবকেও! তিনি সত্যিই যদি থাকেন, তবে আমাদের হস্তগত হ'লে তিনি বোধ করি খুসি হবেন!"

সুন্দরবাবু এতক্ষণ পরে ভরসা ক'রে মন্দিরের ভিতরে এগিয়ে গিয়ে বললেন, "হুম্! বেটা অজগর! তুমি আমাদেরই জলযোগ করবার ফিকিরে ছিলে বটে!"

ব'লেই তিনি মৃত অজগরের কুণ্ডলীর উপরে বন্দুক দিয়ে একটা আঘাত করলেন।

এবং যেমন আঘাত করা, অমনি সঙ্গে সঙ্গে অজগরের মৃত-দেহটা কুণ্ডলী পাকিয়ে লাফিয়ে উঠল!

সুন্দরবাবু মৃত অজগরের এমন কল্পনাতীত ব্যবহার আশা করেন নি, তিনি ভয়ানক ভড়্কে হঠাৎ পিছিয়ে আসতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে মস্ত ব্যায়াম-বীরের মত আশ্চর্য্য এক ডিগ্‌বাজি খেয়ে মেঝের উপরে সশব্দে আছাড় খেয়ে পড়লেন এবং ষাঁড়ের মত স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, "ওরে বাবারে, অজগরটা এখনো জ্যান্তো

আছে যে রে, আমার প্রাণ গেল রে!"

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি সুন্দরবাবুকে অতি-অনায়াসে মাটি থেকে শূন্যে তুলে নিয়ে স'রে এল এবং তাঁকে আবার সোজা ক'রে দাঁড় করিয়ে দিলে!

অজগরের দেহটা তখনো ফুলে ফুলে উঠছে এবং কুণ্ডলীর পর কুণ্ডলী পাকাচ্ছে।

সুন্দরবাবু মহাভয়ে আর একবার সেইদিকে তাকিয়েই বেগে পলায়ন করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু জয়ন্ত হাত ধ'রে তাঁকে টেনে রাখলে।

সুন্দরবাবু পাগলের মতন ব'লে উঠলেন, "আমাকে ছেড়ে দাও জয়ন্ত আমাকে ছেড়ে দাও! আমি অজগরের খোরাক হতে চাই না!"

জয়ন্ত হেসে বললে, "সুন্দরবাবু, শান্ত হোন!"

—"শান্ত হব? জ্যান্তো অজগরের সামনে শান্ত হব?"

—"ভয় নেই সুন্দরবাবু! অজগরের প্রাণ না থাকলেও তার দেহ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে নড়ে চড়ে, কুণ্ডলী পাকায়! অবশ্য তখনো ঐ কুণ্ডলীর ভিতরে গিয়ে ঢুকলে কোন জীবেরই রক্ষা নেই, কিন্তু সে আর তেড়ে এসে কারুকে ধরতে পারে না!"

সুন্দরবাবু দুইচক্ষু বিস্ফারিত ক'রে অজগরটার দিকে তাকিয়ে বললেন, "বটে, বটে, বটে? তাহ'লে আমি আর পালাব না! কিন্তু আমার ভয়ানক লেগেছে! আমি ডিগ্‌বাজি খেয়ে পাথরের মেঝের ওপর আছাড় খেয়েছি—উঃ!"

জয়ন্ত একপাশ দিয়ে এগিয়ে ভাঙা বেদীর সুড়ঙ্গ-মুখের কাছে গিয়ে প্রসন্ন কণ্ঠে বললে, "এখন দূরে যাক সমস্ত দুঃস্বপ্ন, চোখের সামনে জেগে উঠুক পদ্মরাগ-বুদ্ধের প্রতিমা! হাতী সিং, সকালেই আবার জ্বালো রাতের আলো—কেননা পাতালে দিনও নেই, রাতও নেই, আছে সুধু রন্ধ্রহীন অন্ধকার!"

হাতী সিংয়ের লোকজনেরা আলো জ্বাল্‌লো, সকলে আবার পাতালপুরীর সোপান দিয়ে নীচে নামতে লাগল—সঙ্গে সঙ্গে রবিকরোজ্জ্বল প্রভাতের সমস্ত রং আর সুর আর গন্ধের সঙ্গে ঘটল বিচ্ছেদ।

সুড়ঙ্গের সুদূর অন্ধকারের পানে তাকিয়ে সুন্দরবাবুর কাণে-কাণে মাণিক বললে, "আচ্ছা, অজগরের বিধবা বউ যদি ওখানে থাকে, তাহ'লে আপনি কি করবেন?"

সুন্দরবাবু চমকে উঠে খুব সন্দেহের সঙ্গে সুমুখের দিকে চেয়ে বললেন, "আমাকে আর নতুন ভয় দেখিও না মাণিক!"

অজগরের বিধবা বউয়ের সঙ্গে কারুর আর দেখা হ'ল না বটে, কিন্তু নতুন এক নিরাশায় ভেঙে পড়ল সকলের মন।

সোজা পথ, কোথাও কোন শাখা-প্রশাখা নেই। কিন্তু খানিক পরেই পথ গেল ফুরিয়ে। সুমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক নিথর পাথরের দেওয়াল!

সকলে খানিকক্ষণ হতভম্বের মত পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

অমলবাবু ভাঙা-ভাঙা গলায় বললেন, "এই পাথরের দেওয়ালে মাথা ঠুকে আমাদের সকল আশার আজ অন্ত হ'ল!"

সুন্দরবাবু বললেন, "শেষটা যে এই হবে, আমি তা জানতুম! হুম্‌, পদ্মরাগ-বুদ্ধ না অশ্বডিম্ব-বুদ্ধ! ধাপ্পা বাবা, ধাপ্পা!"

মাণিক বললে, "তাহ'লে অকারণে এত কষ্ট ক'রে এই সুড়ঙ্গ কাটা হয়েছিল কেন?"

অমলবাবু বললেন, "এ হচ্ছে নাগরাজ্য, নাগ ছিল এখানকার প্রতীক! ওঙ্কারধামের ভাস্কর্য্যে সর্ব্বত্রই তাই নাগ-মূর্ত্তির ছড়াছড়ি! ভারতের অনেক তীর্থক্ষেত্রে যেমন পবিত্র কুমীর পোষা হয়, বাংলা-দেশে যেমন বাস্তুসাপকে ঠাঁই দেওয়া হয়, এই মন্দিরেও তেমনি সুড়ঙ্গ কেটে পবিত্র অজগরকে রাখা হয়েছিল!"

জয়ন্ত ভাবতে ভাবতে মাথা নেড়ে বললে, "উঁহু! আপনার যুক্তি মনে লাগছে না! যে-অজগরকে মনে করা হয় পবিত্র, ভক্তরা সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ ক'রে তাকে কখনো কবর দিয়ে জ্যান্তো মারবার ব্যবস্থা করত না!···আমার মনে একটা সন্দেহ জাগছে! হাতী সিং, তোমার লোকজনদের এগিয়ে আসতে বল! ভেঙে ফেলুক তারা এই পাথরের দেওয়াল! দেখা যাক দেওয়ালের ওপাশে কি আছে?"

ব'লেই সে রূপোর শামুকের নস্যদানী বার ক'রে ঘন ঘন নস্য নিতে লাগল।

মাণিক জানত, জয়ন্ত খুসি হ'লে নস্য না নিয়ে পারে না!

কিন্তু আপাতত আনন্দের বদলে সে আশঙ্কার কারণই খুঁজে পেলে। তাড়াতাড়ি বললে, "জয়, সেই পুকুরের কথা তোমার মনে আছে তো? পুকুরের কোণ থেকে যে পথটা মন্দিরে গিয়ে পৌঁছেচে, এই সুড়ঙ্গ আছে ঠিক তার নীচে। সুতরাং আমরা এখনো হয়তো সেই পুকুরের পাশে বা নীচে এসে দাঁড়িয়েছি। দেওয়াল ভাঙলে সুড়ঙ্গের ভিতর হুড়-হুড় ক'রে জল ঢুকতে পাবে! তখন আমাদের কী দশা হবে?"

জয়ন্ত বললে, "সব দেওযাল তো একসঙ্গে ভাঙা হবে না, জল ঢুকলে পালাবার ঢের সময় পাওয়া যাবে।······ভাঙো দেওয়াল!"

দেওয়ালের উপর পড়তে লাগল কুড়ুলের পর কুড়ুলের ঘা! শক্ত দেওয়াল! সহজে ভাঙা যায় না। অনেক কষ্টে একখানা পাথর সরানো হ'ল।

কিন্তু জল-টল্ কিছুই ভিতরে ঢুকল না।

জয়ন্ত সেই ফাঁকটার ভিতরে হাত চালিয়ে অল্পক্ষণ কি অনুভব করলে। তারপর মহা উৎসাহে ব'লে উঠল, "চালাও কুড়ুল! সরাও পাথর! আমার সন্দেহ মিথ্যে নয়! সুড়ঙ্গ অকারণে কাটা হয় নি!"

মাণিকও তাড়াতাড়ি সেই ফাঁকের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে

সানন্দে চেঁচিয়ে উঠল, "দেওয়ালের ওপাশে কাঠের মত কি হাতে ঠেকছে! বোধ হয় দরজা!"

সুন্দরবাবু বিপুল কৌতূহলে বললেন, "অ্যাঁ? বল কি! দরজা? আলিবাবার চল্লিশ দস্যুর রত্নগুহা, চিচিংফাঁক, চিচিংফাঁক, চিচিংফাঁক!"

ঠকাং! ঠকাং! ঠকাং! চলল সমানে কুড়ুলের পর কুড়ুল! খ'সে পড়ছে, ভেঙে পড়ছে পাথরের পর পাথর! এক-একখানা পাথর খসে, আর নেচে নেচে ওঠে সকলের প্রাণ!.........

দরজাই বটে! খুব বড় দরজা নয়, ছোট দরজা! তিন ফুটের বেশী উঁচু নয়, কিন্তু বিলক্ষণ মজবুৎ! আগাগোড়া লোহার কিল মারা! পাথরের চেয়ে কঠিন! আর সেই দরজায় লাগানো রয়েছে একটা পুরোণো মস্ত পিতলের কুলুপ!

জয়ন্ত বললে, "কুলুপের ভিতরে বেশ ক'রে তেল ঢেলে দাও! বহুকাল ও-কুলুপে চাবি ঢোকেনি, তেলে না ভিজলে খুলবে না!"

সুন্দরবাবু বললেন, "তেল তো ঢালছ, কিন্তু চাবি কোথায়?"

মাণিক বললে, "আমার কাছে! নিশ্চয় সেই চাবিটা এ কুলুপে লাগবে?"

জয়ন্ত বললে, "কুলুপটা ভালো ক'রে তেলে ভিজুক! ততক্ষণে আমরা আর-একবার চা তৈরি করলে নিশ্চয়ই কারুর আপত্তি হবে না? সন্দেশ আর রসগোল্লার টিন আর একবার বার করলে আপনি কি রাগ করবেন সুন্দরবাবু?"

সুন্দরবাবু ভুঁড়ির উপরে স্নেহভরে হাত বুলোতে বুলোতে এক-গাল হেসে বললেন, "রাগ! আমার এ ভুঁড়ি পর্ব্বতপ্রমাণ সন্দেশ-রসগোল্লার স্বপ্ন দেখে! এ ভুঁড়ি কখনো পরিপূর্ণ হয় না! বিশ্বাস না হয়, আজকেই পরখ ক'রে দেখতে পারো—হুম্!"

মাণিক স্বহস্তে দ্বিতীয় দফা চা তৈরি করতে বসল।

অমলবাবু বললেন, "এইবারে পদ্মরাগ বুদ্ধের সব রহস্য টের

পাওয়া যাবে !"

জয়ন্ত বললে, "হ্যাঁ, পদ্মরাগ-মণির সঙ্গে বুদ্ধদেবের সম্পর্ক কি, এইবারেই তা জানতে পারব! অবশ্য এটা আমার জানা আছে যে, পৃথিবীর মধ্যে সব-চেয়ে-ভালো পদ্মরাগ-মণি ব্রহ্মদেশ ছাড়া আর কোথাও জন্মায় না! পৃথিবীতে সব-চেয়ে কঠিন বস্তু হচ্ছে হীরক, তারপরেই পদ্মরাগের স্থান। কিন্তু সমান-ওজনের হীরকের চেয়ে পদ্মরাগ-মণি বেশী-মূল্যবান !"

চায়ের পিয়ালা যখন খালি হ'ল, সন্দেশ-রসগোল্লা যখন ফুরুলো, তখন মাণিক সগর্ব্বে বার করলে তার পকেটের চাবি এবং সেই চাবি ঢুকল কুলুপের গর্ভে। এবং একবার ঘোরাতেই কুলুপ গেল খুলে !

সমস্ত গুহা চীৎকার-শব্দে পরিপূর্ণ ক'রে জয়ন্ত বললে, "জয় পদ্মরাগ-বুদ্ধের জয় !"

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে দেখা গেল, ছোট একটি ঘর।

তার মেঝে, তার দেওয়াল, তার ছাত সব পাথরে গড়া। সুতীব্র আধুনিক আলোকের আঘাতে কতকাল পরে সেখানকার প্রাচীন ও নিবিড় অন্ধকারের মৃত্যু হ'ল, তার হিসাব কেউ জানেনা !

ঘরে আর কোন আসবাব নেই, কেবল মাঝখানে রয়েছে কোন ধাতু দিয়ে গড়া একটি মাঝারি সিন্দুক !

জয়ন্ত ঘরের চারিদিক তাকিয়ে বললে, "মাণিক, দেখ! পাথরের ঘর, তবু স্যাঁৎসেতে। পাথরের জোড়ের ভিতর দিয়ে জল গড়াচ্ছে! ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছ ?"

—"পারছি, জয়! এই ঘরটা আছে সেই পুকুরের নীচে।"

—"এখন এটাও বুঝতে পারছ তো, নক্সায় পুকুরের পশ্চিম কোণে সেই চিহ্নিত জায়গাটা কেন আঁকা হয়েছে ? পুকুরের তলায় এই ঘরটা আছে, মন্দিরগামী রাস্তার তলায় এই সুড়ঙ্গটা আছে, বেদীর তলায় সিঁড়ির সার আছে, নক্সা দিয়েছে তারই ইঙ্গিত! সাধারণ লোকে নক্সা দেখলেও কিছু বুঝতে পারত না—কিন্তু

আমরা হচ্ছি অসাধারণেরও চেয়ে অসাধারণ! কারণ অসাধারণ লোক নক্সার রহস্য বুঝতে পারলেও সুড়ঙ্গের দরজা ঢাকা পাথরের দেওয়াল দেখে ফিরে যেতে বাধ্য হ'ত, কিন্তু আমরা ফিরে যাই নি। অতএব অনায়াসেই গর্ব্ব করতে পারি! এখন তোল ঐ সিন্দুকের ডালা!"

সিন্দুকের ডালা তুলেই সকলে অবাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল!...

সিন্দুকের ভিতরে লণ্ঠনের আলো পড়বার আগেই তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এল যেন একটা সুতীব্র রক্তজ্যোতির ঝটকা!

তারপরেই দেখা গেল টক্‌টকে লাল ও জ্বল-জ্বলে পাথরে তৈরি একটি অতি-আশ্চর্য্য ও অতুলনীয় বুদ্ধমূর্ত্তি সেখানে কারুকার্য্যে বিচিত্র সুবৃহৎ স্বর্ণপাত্রে শোয়ানো রয়েছে!

মূর্ত্তিটি দৈর্ঘ্যে একহাতের কম হবে না!

জয়ন্ত বিস্ময়-বিহ্বল স্বরে বললে, "মূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে যেন লাল-আলো ঠিক্‌রে পড়ছে, চোখে লাগছে ধাঁধা! এ মণিময় মূর্ত্তি না হয়ে যায় না! না-জানি এর দাম কত কোটি টাকা! মাণিক, মাণিক! এ কি সত্যি, না অসম্ভব স্বপ্ন?"

মাণিক আবেগে নিরুত্তর হয়ে মূর্ত্তির মণিময়, দীপ্ত ও মসৃণ গায়ে হাত বুলিয়ে দেখতে লাগল।

দুইচক্ষু ছানাবড়ার মতন ক'রে সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্! পদ্মরাগ-মণি কেটে এত-বড় মূর্ত্তির তৈরি করা হয়েছে? পদ্মরাগ-মণি এত বড় হয়!"

মাণিক বললে, "না সুন্দরবাবু, অনেকগুলো পদ্মরাগ-মণি একসঙ্গে জুড়ে শিল্পী এই মূর্ত্তি গড়েছে। কিন্তু এমনি তার হাতের কায়দা যে, কোথাও জোড় ধরবার উপায়ই নেই!"

জয়ন্ত কিছু বললে না, অভিভূত প্রাণে মূর্ত্তিটিকে সযত্নে তুলে সিন্দুকের উপর বসিয়ে দিলে। অপার্থিব আনন্দের মত ঘোররক্তবর্ণ

সেই মহামানবমূর্ত্তির প্রভা যেন আধুনিক সমুজ্জ্বল আলোগুলোকেও লজ্জা দিতে লাগল!

সেই জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির সামনে দুইহাত জোড় ক'রে হাঁটু গেড়ে ব'সে প'ড়ে অমলবাবু ভক্তিভরে বলে উঠলেন—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি! ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি! সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি!"